করিতে থাকে। ভাল, যেন আমরাই চুপ করিলাম কিন্তু তোমাদের আপনাদিগকে থামাও দেখি? তোমাদের মধ্যে যাঁহারা স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মের পতাকা ধরিয়া দণ্ডায়মান হন, তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসিত কর, তোমাদের জাতীয় প্রকৃতিতে যে ন্যায়পরতার আদর্শ আছে তাহাকে পরিহাস করিয়া ম্লান করিয়া দাও।

কিন্তু সে কিছুতেই হইবে না। তোমাদের রাজনীতির মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধি একটা সত্য পদার্থ। কথনো বা তাহার জয় হয় কখনো বা তাহার পরাজয় হয় কিন্তু তাহাকে বাদ দিয়া চলিতে পারে না। আয়র্লণ্ড্ যখন ব্রিটানিয়ার নিকট কোন অধিকার প্রার্থনা করে তখন সে যেমন একদিকে খুনের ছুরিতে শান দিতে থাকে তেমনি অন্যদিকে ইংলণ্ডের ধর্ম্মবুদ্ধিকে আপন দলে লইতে চেষ্টা করে। ভারতবর্ষ যখন বিদেশী স্বামীর দ্বারে আপন দুঃখ নিবেদন করিতে সাহসী হয় তখন সেও ইংরাজের ধর্ম্মবুদ্ধিকে আপন সহায় করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। মাঝে হইতে ইংরাজের রাজকার্য্যে ল্যাঠা বিস্তর বাড়িয়া যায়।

কিন্তু যত দিন ইংরাজপ্রকৃতির কোথাও এই সচেতন ধর্ম্মবুদ্ধির প্রভাব থাকিবে, যত দিন তাহার নিজের মধ্যেই তাহার নিজের সুকৃতি দুষ্কৃতির একটি বিচারক বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন আমাদের সভাসমিতি বাড়িয়া চলিবে, আমাদের সংবাদপত্র ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে। ইহাতে আমাদের বলবান ইংরাজগণ বিফল গাত্রদাহে যতই অধীর হইয়া উঠিবে আমাদের উৎসাহ এবং উদ্যমের আবশ্যকতা ততই আরও বাড়াইয়া তুলিবে মাত্র।

পশুপ্রীতি।

প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতির প্রতি অনুরাগের সহিত সমস্ত জীবজগতের প্রতি একটি প্রগাঢ় সহানুভূতি দেখা যায়। গোযূথ, চক্রবাক্‌মিথুন, কলহংস এবং মৃগশাবক সংস্কৃত সাহিত্যরাজ্যের একটি সুবৃহৎ সামাজিকতার মধ্যে কেমন সুন্দর স্থান অধিকার করিয়া আছে—মানুষের সুখদুঃখ এবং দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে তাহারা কেমন সহজে অবাধে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, তাহারা আমাদের যেন পর নহে, ঘরের লোকের মত।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে পশু জাতির প্রতি মমতা ব্যক্ত হয় নাই একথা বলিলে নিতান্তই অত্যুক্তি হইয়া পড়ে। ইঁদুরকে সম্বোধন করিয়া কবি বার্ণ্‌সের যে করুণার্দ্র বাৎসল্যপূর্ণ কবিতাটি আছে তাহার তুলনা অন্য দেশের কোন কবিতায় পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সংস্কৃত সাহিত্যে ত দেখা যায় না।

কিন্তু আমার বিবেচনায় না থাকিবার একটি কারণ আছে। কবি বার্ণ্‌সের যে কবিজন-সুলভ মমত্ব, তাহা যেন চতুর্দ্দিকের নির্দ্দয়তার নিপীড়নে কিছু সচেতন বেগে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি জানেন এই অসহায় জীবকে কেহ দয়ার চক্ষে দেখে না, তিনি জানেন অকারণে খেলাচ্ছলে পশুহত্যা মানুষের আমোদের একটা অঙ্গ হইয়া গেছে, সেই জন্য চতুর্দ্দিক্‌ হইতে বাধা এবং ব্যথা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার দয়া এমন প্রবলভাবে স্নেহসঙ্গীতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে কবিহৃদয়ের দয়া চতুর্দ্দিকের সমাজ কর্ত্তৃক সেই বেদনা প্রাপ্ত হয় নাই, এই জন্য তাহা উচ্ছ্বসিত গীতে পরিণত হইতে পারে নাই, তাহা কেবল একটি আত্মবিস্মৃত অচেতন স্নেহে

সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। প্রকৃতি, পশু এবং মানব একটি সহজ প্রেমে যেন এক গার্হস্থ্যের অঙ্গ হইয়া বিরাজ করিতেছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যে মৃগয়া ছিল না তাহা নহে, কিন্তু ক্রীড়ার্থে পশুহনন কেবল রাজাদের মধ্যে বদ্ধ ছিল—সাধারণ হিন্দুপ্রকৃতির সহিত উক্ত কার্য্যের যেন একটা অসামঞ্জস্য ছিল। সেই জন্য মৃগয়ায় —অন্য দেশের কবি যেখানে অশ্বের হ্রেষারবে ও কুক্কুরগণের উল্লাস-কোলাহলে উৎসাহিত হইয়া শোণিতাক্তকলেবর পলায়মান পশুর পশ্চাতে জয়োল্লাসে ধাবমান হয়েন—সংস্কৃত কবির করুণ হৃদয় সেই প্রাণভয়ে পলায়মান আর্ত্তের দুঃখে বিগলিত হইয়া আসে এবং তাঁহার শিকারদৃশ্য উল্লাসের পরিবর্ত্তে করুণাই উদ্রেক করে।

কাদম্বরীর প্রারম্ভেই ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। শুকমুখে বাণভট্ট যেখানে ব্যাধগণের অত্যাচার উপদ্রবের বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার এই সহৃদয়তা, পশুজগতের প্রতি—অহিংসা মাত্র নহে—আন্তরিক নিবিড় অনুরাগ বর্ণনার পর বর্ণনায় প্রতি ছোট-খাট ঘটনার উল্লেখে কেমন প্রগাঢ় হইয়া ফুটিয়াছে।

সেই যমদূতসদৃশ বিকটমূর্ত্তি জবালোহিতচক্ষু নিষ্ঠুর শবরসেনা, নরকের দ্বারপালসদৃশ ভীষণ সেনাপতি, প্রাণভয়ে পলায়মান সিংহ মাতঙ্গ কুরঙ্গগণের গর্জ্জন ও চীৎকারে আলোড়িত বনরাজি, জরচ্ছবরের নৃশংস পক্ষীবধব্যাপার ও নিরীহ পক্ষীকুলের অন্তরে দারুণ ভীতিসঞ্চার, প্রতি বর্ণনায় বাণভট্টের অন্তর হইতে বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায়, পাশবদ্ধ পক্ষীশাবকের ন্যায় একটি করুণ আর্ত্তনাদ বাহির হইয়াছে, যে করুণ স্বরে ব্যাধগণের সমস্ত উল্লাসকোলাহল ডুবিয়া গিয়াছে।

কাদম্বরীর গ্রন্থকার যে অধিক হা হুতাশ করিয়াছেন তাহা নহে, এবং মৃগয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অহিংসার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দীর্ঘ

নীতি-উপদেশও প্রদান করেন নাই, কিন্তু অত্যন্ত সহজভাবে সমস্ত বর্ণনায় একটি গভীর সহানুভূতি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। বৃদ্ধ শবরের পক্ষীবধ বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে বোধ করি ক্ষতি নাই।

"কিমিব হি দুষ্করম করুণানাং, যতঃ স তমনেকতালতুঙ্গমভ্রঙ্কষশাখাশিখর-মপি সোপানৈরিবাযত্নেনৈব পাদপমধিরুহ্য,তামনুপজাতোৎপতনশক্তীন্, কাংশ্চিদল্পদিবসজাতান্ গর্ভচ্ছবিপাটলান্ শাল্মলিকুসুমশঙ্কামুপজনয়তঃ, কাংশ্চিদুদ্ভিদ্যমানপক্ষতয়া নলিনসংবর্ত্তিকানুকারিণঃ, কাংশ্চিদর্কোপলসদৃশান্, কাংশ্চিল্লোহিতায়মানচঞ্চুকোটীন্ ঈষদ্বিঘটিতদলপুটপাটলমুখানাং কমলমুকুলানাং শ্রিয়মুদ্বহতঃ, কাংশ্চিদনবরতশিরঃকম্পব্যাজেন নিবারয়ত ইব, প্রতীকারাসমর্থান্, একৈকশঃ ফলানীব তস্য বনস্পতেঃ শাখাসন্ধিভ্যঃ কোটরান্তরেভ্যশ্চ শুকশাবকানগ্রহীৎ, অপগতাসূংশ্চ কৃত্বা ক্ষিতাবপাতয়ৎ।"

এই পক্ষীশাবকগুলির বর্ণনাই কি সকরুণ! কেহ এখনও উড়িতে শিখে নাই, কেহ অতি অল্প দিন হইল জন্মিয়াছে সেই জন্য গর্ভচ্ছবিপাটলবর্ণ—যেন শাল্মলী কুসুমগুলির মত, কাহারও অল্প অল্প নূতন ডানা যেন পদ্মের নবদলের মত উঠিয়াছে, কাহারও লোহিতায়মান ক্ষুদ্র চঞ্চু যেন পদ্মকলির একটুখানি খোলা মুখটুকুর মত, কেহ বা অবিরত শিরঃকম্প দ্বারা এই নিষ্ঠুরকে যেন তাহার অকরুণ কার্য্যে নিবারণ করিতে চাহিতেছে। এই সমস্ত প্রতীকারে অসমর্থ বিহগশিশুগুলিকে যেন এক একটি ফলের মত বনস্পতির শাখাসন্ধি হইতে কোটরাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া নিষ্ঠুর শবর যখন গ্রীবা মোটনপূর্ব্বক ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কবির হৃদয়ে তখন কি শেলই বিঁধিতেছিল!

সেই জীর্ণ শাল্মলী-তরুকোটরে বহু যুগ ধরিয়া বহু পক্ষীবংশ নির্ব্বিঘ্নে বাস করিয়া আসিতেছে। প্রভাত হইলে তাহারা দিকে দিকে আহারান্বেষণে বহির্গত হয় এবং আহারানন্তর প্রত্যাগত হইয়া

কুলায়াবস্থিত শাবকদিগকে চঞ্চুপুটের দ্বারা শালিধান্যমঞ্জরী খাওয়াইয়া দেয় এবং শাবককে ক্রোড়াস্তে নিহিত করিয়া সেইখানেই দীর্ঘ নিশা যাপন করে।

একটি জীর্ণ কোটরে একটি বৃদ্ধ শুকদম্পতি নিরিবিলি বাস করিত। বৃদ্ধবয়সে তাহাদের একটি সন্তান হয়। প্রবল প্রসব-বেদনায় অভিভূত হইয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাহার জননী প্রাণত্যাগ করিল। বৃদ্ধ পত্নীবিয়োগে অতিমাত্র কাতর হইলেও সুতস্নেহবশতঃ শাবকের লালনপালন ও তৎসম্বর্দ্ধনে যত্নবান্ হইয়া একাকী কায়ক্লেশে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিতে লাগিল। বয়সের আধিক্য-হেতু ও বহুদিনের অনভ্যাসবশতঃ তাহার আর উড়িবার শক্তি ছিল না। নবশেফালিকাকুসুমবৃন্তের ন্যায় পিঞ্জরবর্ণ চঞ্চুপুট দ্বারা পরনীড়নিপতিত শালিবল্লরী হইতে তণ্ডুলকণা গ্রহণ করিয়া করিয়া ও তরুমূলনিপতিত শুককুলাবদলিত ফলশকল সংগ্রহ করিয়া শাবককে আহার করাইত এবং শাবকের ভুক্তাবশিষ্ট নিজে আহার করিত।

সেদিন প্রভাতে মৃগয়াকোলাহলে জাগিয়া উঠিয়া শবরকে তরু অভিমুখে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধের সর্ব্বশরীর ভয়ে দ্বিগুণতর কম্পিত হইতে লাগিল, তালু শুষ্ক হইয়া আসিল, এবং অশ্রুপরিপ্লুত ভয়-বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সন্তানস্নেহপরবশ বৃদ্ধ,শাবককে পক্ষপুটে আচ্ছাদিত করিয়া প্রাণপণে বক্ষতলে চাপিয়া রহিল। শবর যখন তাহার কুলায়সমীপে আসিয়া কোটরের মধ্যে স্বীয় বিবিধবনবরাহবসাবিস্রগন্ধী অনবরত কোদণ্ডগুণাকর্ষণহেতু ব্রণাঙ্কিতপ্রকোষ্ঠ যমদণ্ডসদৃশ বাম বাহু প্রবেশ করাইয়া দিল, বৃদ্ধ চঞ্চুদ্বারা তাহাকে যথাশক্তি আঘাত করিল, কিন্তু সে বাহুপাশ ছাড়াইতে পারিল না। শবর তাহাকে বাহির করিয়া

বধ করিল এবং বক্ষতলে শিশুসহ বৃদ্ধ শুক ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইল।

এই শিশু শুক কালক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজসন্নিধানে আপন পিতার অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছে :—

"তাতস্তু তং মহান্তমকাণ্ডএব প্রাণহরমপ্রতীকারমুপপ্লবমুপনতমবলোক্য দ্বিগুণতরোপজাতবেপথুঃ, মরণভয়াদুদ্ভ্রান্ততরলতারকাং বিষাদশূন্যামশ্রুজলপ্লুতাং দৃশমিতস্ততো দিক্ষু বিক্ষিপন্, উচ্ছুষ্কতালুরাত্মপ্রতীকারাক্ষমঃ, ত্রাসস্রস্তসন্ধিশিথিলেন পক্ষপুটেনাচ্ছাদ্য মাং তৎকালোচিতপ্রতীকারং মন্যমানঃ, স্নেহপরবশো মদ্রক্ষাকুলঃ কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ়ঃ ক্রোড়ভাগেন মামবষ্টভ্য তস্থৌ। অসাবপি পাপঃ ক্রমেণ শাখান্তরৈঃ সঞ্চরমাণঃ কোটরদ্বারমাগত্য, জীর্ণাসিতভুজঙ্গভোগভীষণং প্রসার্য্য বিবিধবনবরাহবসাবিস্রগন্ধিকরতলমনবরতকোদণ্ডগুণাকর্ষণব্রণাঙ্কিতপ্রকোষ্ঠমন্তকদণ্ডানুকারিণং বামবাহুমতিনৃশংসো মুহুর্মুহুর্দত্তচঞ্চুপ্রহারমুৎকূজন্তং তমাকৃষ্য তাতমপগতাসুমকরোৎ।"

এই দৃশ্যে কবির সহানুভূতি কোন্‌খানে তাহা আর ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না। বৃদ্ধ শুক তাহার পত্নীবিয়োগের পর যে কত কষ্ট এবং কত স্বার্থত্যাগ স্বীকারপূর্ব্বক আপন শাবকটিকে প্রাণপণে পালন করিয়া আসিয়াছে এবং সেই অনেক দুঃখের পালিত সন্তানটিকে রক্ষা করিবার জন্য যে কি যন্ত্রণা সহ্য করিয়া মরিল—এই বর্ণনাতেই কবিহৃদয় সম্যক্‌ ব্যক্ত হইয়াছে। পক্ষীকুলের অন্তরের মধ্যে তিনি কেমন প্রবেশ করিয়াছেন! কেমন সহৃদয়তার সহিত সুন্দররূপে তিনি দেখাইয়াছেন যে, আমাদের সন্তান আমাদের নিকট যেমন প্রাণাধিক প্রিয়, পাখীর সন্তানও পাখীর কাছে ঠিক সেইরূপ! ভিন্নজাতীয় জীবের প্রতি করুণা সঞ্চার করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমরা কল্পনা অভাবে অন্য জীবের সুখদুঃখ অনুভব করিতে পারি না, কবি যখন দেখাইয়া দেন, আমাদের জননীর বাৎসল্য পিতার স্নেহ জীবনের মমতা ঐ

জায়াহীন পাখীর নীড়ের মধ্যেও আছে, তখন সেই "Touch of nature makes the whole world kin." তখন আমাদের হৃদয় সমস্ত অনাথ জীবজন্তুর প্রতি আত্মীয়ভাবে ধাবিত হয়।

কেবলমাত্র কাদম্বরীতে নহে, জীবজগতের প্রতি এইরূপ সহানুভূতি সংস্কৃত কাব্যে প্রায়ই দেখা যায়। রঘুবংশের নবম সর্গে মৃগয়ার মধ্যস্থলে রাজা দশরথের লক্ষ্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য সহচরী হরিণী প্রিয়তম হরিণকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, এবং তদ্দর্শনে কঠিন রাজহৃদয়েও দাম্পত্যের নিবিড় অনুরাগ ঘনাইয়া আসে; শিখীকুলের বর্হবৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া উদ্যত বাণ তূণীরে ফিরিয়া আসে, এবং এই মৃগয়ামত্ততার মধ্যেও মানবহৃদয়ের অন্তস্তল হইতে সকরুণ স্নেহ ক্ষরিত হইতে থাকে।

শকুন্তলার প্রথম দৃশ্যেও দুষ্মন্তের মৃগানুসরণে কালিদাসের এই গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। নহিলে, উদ্যতবাণ দুষ্মন্তের মুখ দিয়া তিনি সেই গ্রীবাভঙ্গাভিরাম সৌন্দর্য্য বর্ণনা করাইবেন কেন? এরূপ সহৃদয়তার সহিত যে প্রাণভয়ে ধাবমান পশুর সৌন্দর্য্য অনুভব করে, চতুরা মৃগয়া তাহাকে কঠিন করিয়া তুলিতে পারে নাই।—ঋষি রাজাকে শরসন্ধানে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যে শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা যেন পশুবৎসল ভারতবর্ষের ব্যথিত হৃদয়ের ভাষা। আহা, এই হরিণকের অতিলোল জীবনটি কতটুকুই বা, আর কোথায় তোমার বজ্রসার শর—পুষ্পরাশির মধ্যে কি আগুন ধরাইতে আছে! কবি বড় করুণার সহিত এই কথা বলিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে মৃগয়া আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা নিবারণের উদ্যত বাহু আছে—মনের সহিত সেই নিষ্ঠুর প্রমোদে কবি যোগ দিতে পারেন নাই।

কালিদাস পশুজগতের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। তপোবনে কাম-

ধেনু নন্দিনীর সেবার কথা পাঠ কর। সেই অনিন্দ্যতনু ধেনুর নবকিসলয়সদৃশ চিক্কন পাটল বর্ণ ও ললাটতটে প্রদোষসময়ের নবোদিত শশিকলাসদৃশ ঈষৎ বক্র শ্বেত রেখা বর্ণনা করিয়া কবি কত আনন্দলাভ করিয়াছেন! রাজা যখন রথারোহণে গুরুগৃহে অথবা মৃগয়ায় বাহির হন, কালিদাস সমস্ত পথ তাঁহার অশ্বের নিভৃতোর্দ্ধকর্ণ নিষ্কম্পচামরশিখা গতিবেগসৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চলেন; এবং কি বশিষ্ঠাশ্রমে, কি মালিনীনদীতীরে, রথ হইতে অবতরণকালে রাজমুখে অশ্বদিগকে বিশ্রাম করাইবার আদেশ দিতে কখনও ভুলেন না।

এই সহানুভূতি শকুন্তলার বিদায়দৃশ্যে—যেখানে হরিণশিশু বারবার অঞ্চল ধরিয়া টানিয়া গমনোদ্যতা শকুন্তলাকে ধরিয়া রাখিতে চাহে এবং হরিণশিশুর স্নেহে শকুন্তলার নয়ন ছলছল করিয়া আসে—সেইখানেই সম্যক্ মনোহারী হইয়া উঠিয়াছে। নিপুণ চিত্রকর কালিদাস এইরূপে চতুর্দ্দিকের সুন্দর প্রকৃতির মধ্যস্থলে মানবের সহিত মৃগহৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাঁধিয়া দিয়া যে একখানি সুন্দর চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন, তাহার মর্ম্মস্থলে কবিহৃদয়ের অনেকখানি বেদনা, পশুজগতের প্রতি অনেকখানি সহানুভূতি যেন আপনা হইতে নিঃশব্দে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে।

ভবভূতির নাটকেও এ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্কে সীতার, পালিত করিশিশু ও ময়ূরবর্ণনায় এই অনুরাগ অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এবং সেই সঙ্গে প্রকৃতি, পশু এবং মানবের সম্মিলনে সংস্কৃত কবির হৃদয় কিরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে।—শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্কের সহিত উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্ক, বিদায় এবং পুনর্মিলন দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন

বিষয়ক হইলেও, দৃশ্যাংশে নিতান্ত বিসদৃশ নহে। এবং ভাবের ঐক্যে উভয় নাটকের পাত্রপাত্রীগণও যেন এইখানে কতকটা ঘনিষ্ঠ হইয়া আসে।

পশুস্নেহ ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির যে এক প্রধান লক্ষণ তাহা একটি কাহিনীতে স্থন্দর ব্যক্ত হইয়াছে। ব্যাধ যখন ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে একটিকে বধ করিল তখনই বাল্মীকির মুখে ছন্দোবদ্ধ শ্লোক উচ্চারিত হইল। যুদ্ধ নহে, স্ত্রীপুরুষের প্রেম নহে, জীবে দয়াই ভারতবর্ষে প্রথম শ্লোক উৎপত্তির কারণ। কথাটা ঐতিহাসিক সত্য না হইতে পারে, বাল্মীকির পূর্ব্বেও দেবস্তুতি উপলক্ষ্যে অনুষ্টুপ ছন্দ রচিত হইতে পারে, কিন্তু গল্পটির মধ্যে একটি গভীর সত্য নিহিত আছে। সেটি এই যে, সর্ব্বভূতে দয়া ভারতীয় প্রকৃতির মূল উৎস। সামান্য একটি ক্রৌঞ্চপক্ষীহনন পবিত্র শ্লোকসৃষ্টির আদিকারণ বলিয়া যে দেশে প্রচলিত হইতে পারে, সে দেশের হৃদয়ের কথাটি কি তাহা আর বুঝিতে বাকি থাকে না। এই জন্য

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতঃ॥"

এ শ্লোকটি পবিত্র শ্লোক। না—ব্যাধ কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না, ভারতে সে চিরকাল অভিশপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যে একটা পাখীর দুঃখ বুঝিতে পারে না, কামমোহিত বিহঙ্গকে যে অকাতরে হত্যা করিতে পারে, যাহার চিত্তবৃত্তি এতই অসাড় অচেতন, সে কখনই শাশ্বতী গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না—ইহার মধ্যে বড় একটি গভীর কথা আছে।—দুর্ব্বলের প্রতি স্নেহ, অসহায়ের প্রতি সহানুভূতি পৃথিবীতে বড় কম। কিন্তু যেখানে ইহা দেখা যায় সেখানে মর্ত্ত্য স্বর্গ হইয়া উঠে, সেখান হইতে কুৎসিৎ অত্যাচার চিরদিনের মত নির্ব্বাসিত হয় এবং সেখানে

বৃহৎ মনুষ্যত্ব সমস্ত বিশ্বকে আপন বক্ষনীড়ে টানিয়া আনিয়া নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে। *

---

* এইখানে প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক আমিয়েলের দৈনন্দিন লিপি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহার মধ্যে বড় একটি সার কথা আছে। জন্তুদের প্রতি অবিচার ক্রমে যে মানুষ পর্যন্ত উঠে ইহা একটি চিন্তনীয় বিষয়।

6th October 1866—I have just picked up on the stairs a little yellowish cat, ugly and pitiable. Now, curled up in a chair at my side, he seems perfectly happy, and as if he wanted nothing more. Far from being wild, nothing will induce him to leave me, and he has followed me from room to room all day. I have nothing at all that is eatable in the house, but what I have I give him—that is to say, a look and a caress—and that seems to be enough for him, at least for the moment. Small animals, small children, young lives, —they are all the same as far as the need of protection and of gentleness is concerned. ··· ··· People have sometimes said to me that weak and feeble creatures are happy with me. Perhaps such a fact has to do with some special gift or beneficent force which flows from one when one is in the sympathetic state. I have often a direct perception of such a force; but I am no ways proud of it, nor do I look upon it as anything belonging to me, but simply as a natural gift. It seems to me sometimes as though I could woo the birds to build in my beard as they do in the headgear of some cathedral saint! After all, this is the natural state and the true relation of man towards all inferior creatures. If man was what he ought to be he would be adored by the animals, of

ভারতবর্ষের হৃদয়ে মনুষ্যত্ব অনেকাংশে সেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহার কারণ বোধ হয় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম সর্ব্বলোকে সর্ব্বজীবে, দেবতা হইতে কীটানু এবং কীটানু হইতে অচেতন পরমাণু পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দেবতার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করে। এবং সর্ব্বত্রই দেবতার অধিষ্ঠান জানিয়া সর্ব্ব বিশ্বকে প্রীতি করিয়া

---

whom he is too often the capricious and sanguinary tyrant. The legend of Saint Francis of Assisi is not so legendary as we think ; and it is not so certain that it was the wild beasts who attacked man first. ... But to exaggerate nothing, let us leave on one side the beasts of prey, the carnivora, and those that live by rapine and slaughter. How many other species are there, by thousands and tens of thousands, who ask peace from us and with whom we persist in waging a brutal war ? Our race is by far the most destructive, the most hurtful, and the most formidable, of all the species of the planet. It has even invented for its own use the right of the strongest,—a divine right which quiets its conscience in the face of the conquered and the oppressed ; we have outlawed all that lives except ourselves. Revolting and manifest abuse ; notorious and contemptible breach of the law of justice ! The bad faith and hypocrisy of it are renewed on a small scale by all successful usurpers. We are always making God our accomplice, that so we may legalise our own iniquities. Every successful massacre is consecrated by a Te Deum, and the clergy have never been wanting in benedictions for any victorious enormity. So that what, in the beginning, was

সেই দেবতাকেই প্রীতি করে। সুতরাং তাহার অন্তরে হিংসা ও অপ্রীতি স্বভাবতই সঙ্কুচিত হইয়া আসে। এবং পশু পক্ষী সচেতন হইয়া মনুষ্যত্বের সহবাস লাভ করে। সেই জন্যই বৈষ্ণব কবির গান—

"আজ্ বনে আনন্দ বাধাই।
পাতিয়া বিনোদ খেলা আনন্দে হইলা ভোলা
দূর বনে গেল সব গাই।
ধেনু না দেখিয়া বনে চকিত রাখালগণে
শ্রীদাম সুদাম আদি সবে।

---

the relation of man to the animal becomes that of people to people and man to man.

If so, we have before us an expiation too seldom noticed but altogether just. All crime must be expiated, and slavery is the repitition among men of the sufferings brutally imposed by man upon other living beings; it is the theory bearing its fruits.—The right of man over the animals seems to me to cease with the need of defence and of subsistence. So that all unnecessary murder and torture are cowardice and even crime. The animal renders a service of utility: man in return owes it a need of protection and of kindness. In a word, the animal has claims on man, and the man has duties to the animal.—Buddhism, no doubt, exaggerates this truth, but the Westerns leave it out of count altogether. A day will come, however, when our standard will be higher, our humanity more exacting, than it is to-day. Homo homini lupus, said Hobbes: the time will come when man will be humane even for the wolf—homo lupo homo.

কানাই বলিছে ভাই খেলা ভাঙ্গা হবে নাই
আনিব গোধন বেণুরবে।
সব ধেনু নাম কৈয়া অধরে মুরলী লৈয়া
ডাকিয়া পূরিল উচ্চস্বরে।
ধেনু সব সারি সারি হাম্বা হাম্বা রব করি
দাঁড়াইলা কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাবী শ্যাম অঙ্গ চাটে।
দেখি সব সখাগণ আবা আবা ঘনেঘন
কানুরে করিল আলিঙ্গন।
প্রেমদাস কহে বাণী কানাইর মুরলী শুনি
পশু পাখী পাইল চেতন।"

এবং সেইজন্যই এই চেতনালব্ধ সর্ব্বজীবের তৃপ্ত্যর্থে সর্ব্ব বিশ্বের উদ্দেশে ভারতবর্ষ প্রতিদিন তর্পণ করিয়া থাকে—

"দেবা যক্ষাস্তথা নাগাঃ গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ
বিদ্যাধরা জলধরাস্তথৈবাকাশগামিনঃ
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া।"

বৃত্তিনির্ব্বাচন।

"যার কর্ম্ম তাকেই সাজে, অন্যকে তা লাঠি বাজে" এই কথাটি খুব সত্য। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, যে কর্ম্ম যাকে সাজে সে কর্ম্ম সে পায় না বা করে না। যে ডাক্তার হইবার উপযুক্ত, সে হয় তো আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে—যে আইন-ব্যবসায়ীর

উপযুক্ত সে হয় তো ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করিতেছে। এইরূপ অনুপযোগী কাজে প্রবেশ করিয়া কেহই সফলতা লাভ করিতে পারে না—তাহার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়। অনেক সময় ইহা অভিভাবকদিগের অবিবেচনার ফল। আমাদের দেশে কোন যুবক বিএ পাশ করিয়াছে কি অমনি আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিবার জন্য তাহার অভিভাবক তাহাকে অনুরোধ করেন—সে তাহার উপযুক্ত কি না তাহা তিনি আদৌ বিবেচনা করেন না। অমুক লোক আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ধনশালী হইয়াছে, তবে সেই বা কেন না হইবে—এই তাঁহার যুক্তি। তিনি এটা বুঝেন না—সকলেই সব কাজের উপযুক্ত নহে। ব্যক্তিবিশেষের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা অনুসারে প্রত্যেকের বৃত্তি নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। কেহ বা দৈহিক বলসাপেক্ষ কাজের উপযুক্ত, কেহ বা সুকুমার মিহি কাজের উপযুক্ত, কেহ বা দৌড়ধাপের কাজ ভাল করিতে পারে। কেহ বা চুপ করিয়া একস্থানে বসিয়া লেখাপড়ার কাজ ভাল করিতে পারে। যে কামারের কাজের উপযুক্ত তাহাকে ঘড়ির সূক্ষ্ম কাজে নিযুক্ত করা যেমন বিড়ম্বনা—যে পুলিসের কাজের উপযুক্ত তাহাকে মুন্‌সেফি কাজে নিযুক্ত করা তেমনি বিড়ম্বনা। কিন্তু এ কথা স্বীকার করি, এই বৃত্তিনির্ব্বাচন কাজটিও বড় সোজা নহে। তা ছাড়া আমাদের দেশে কাজকর্ম্মের নির্ব্বাচন-পরিসরও এত সংকীর্ণ যে, অনেককে দায়ে পড়িয়া অনুপযোগী ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়। আরও এক কথা আমাদের যেরূপ জাতীয় প্রকৃতি তাহাতে নূতন পথ উদ্ভাবন করিবার শক্তি অত্যন্ত কম। আমরা অনুকরণ করিতে খুব মজবুৎ। কোন নূতন ব্যবসায়ে যদি কাহাকে সফলতা লাভ করিতে দেখি অমনি গড্ডালিকা-প্রবাহের ন্যায় আমরা সেইদিকে সবেগে অগ্রসর হই। উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত সে বিষয়ে কিছুমাত্র

বিবেচনা করি না। একজন যদি "বুক সপ্" খুলিয়া সফল হইয়া থাকে অমনি দেখিবে রাস্তায় রাস্তায় "বুক্ সপ্" খোলা হইয়াছে—একজন যদি ফুলের দোকান খুলিয়া ধনী হইয়া থাকে তবে দেখিবে রাস্তায় রাস্তায় ফুলের দোকান বসিয়াছে। কলিকাতায় এক সময়ে ময়দা ও তৈলের কলকারখানার ছড়াছড়ি হইয়াছিল, এক্ষণে আবার দর্জ্জির দোকানের বিস্তার দেখা যাইতেছে। ইহার ফল এই দাঁড়ায় কখন কখন এক একটা ব্যবসায় একেবারে মাটি হইয়া যায়। অনর্থক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি হওয়ায়, অনেক সময়ে উপযুক্ত লোকেরাও স্বীয় যোগ্যতার অনুরূপ যথেষ্ট ফললাভ করিতে পারে না এবং যে ব্যবসায়ের যে অনুপযুক্ত সেই ব্যবসায়ে সে নিযুক্ত হইলে তাহার সমস্ত উদ্যম বৃথা নষ্ট হয় এবং যে কাজে সে হয়তো জনসমাজকে উপকৃত করিতে পারিত সেই উপকার হইতে জনসমাজ বঞ্চিত হয়।

কে কোন্ কাজের উপযুক্ত এবং কি জন্য উপযুক্ত তাহার মোটামুটি কতকগুলি নিয়ম এই জন্য সকলেরই জানা উচিত। এ বিষয়ে ফ্রেনলজি কতকটা পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে। প্রচলিত প্রধান প্রধান বৃত্তি ব্যবসায়ের পক্ষে কিরূপ দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ উপযোগী তাহা আমরা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি।

চিকিৎসক। চিকিৎসকের দেহ সম্পূর্ণরূপে সুস্থ এবং তাঁহার দেহে প্রকৃতি-সামঞ্জস্য রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ প্রাণ-প্রধান প্রকৃতি, বল-প্রধান প্রকৃতি ও মন-প্রধান প্রকৃতি তাঁহার দেহে সমান ভাবে সংমিশ্রিত হওয়া আবশ্যক। তাঁহার প্রাণ-প্রকৃতি যথেষ্ট থাকা চাই, কেন না, তাহা হইলে তাঁহার দৈহিক ক্ষয় দ্রুতভাবে ও অজস্রভাবে পূরণ করিতে তিনি সক্ষম হইবেন। তা ছাড়া, এই প্রকৃতি প্রবল থাকিলে, প্রফুল্লতা, উৎসাহ, হৃদ্যতা উৎপন্ন হয়—রোগীর ঘরে প্রবেশ করিতে হইলে এই সকল গুণ থাকা

নিতান্ত আবশ্যক। এই প্রকৃতিতে মানুষ একটু স্থূল একটু মাংসল হয়। বক্ষদেশ গভীর এবং শ্বাস-গ্রহণে শক্তি প্রচুররূপে থাকে। রক্ত-চলাচল দ্রুতভাবে ও প্রচুররূপে হয়, তাহাতে উৎসাহ, আগ্রহ, হৃদ্যতা বর্দ্ধিত হয়। বল-প্রকৃতিও তাঁহার যথেষ্ট থাকা আবশ্যক। মজবুৎ দেহের কাঠাম—মুখাবয়ব সকল বড় বড় ও সমুন্নত, শক্ত চুল এই সমস্ত লক্ষণে বল-প্রকৃতি সূচিত হয়। তাঁহার মন-প্রকৃতিও বিলক্ষণ থাকা চাই। মন-প্রকৃতির প্রাবল্য থাকিলে মনের ক্রিয়া সচেষ্ট ও বেগবান হয়, শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্তি হয়, জ্ঞানের স্পৃহা হয়,—সর্ব্বপ্রকার তথ্য অনুসন্ধানে আগ্রহ হয়। পরিষ্কার তীক্ষ্ণ নেত্র, সুনির্দ্দিষ্ট সুকুমার মুখাবয়ব, সূক্ষ্ম কেশ ও ত্বক্—অপেক্ষাকৃত লঘু অস্থি ও মাংসপেশী, বৃহৎ মস্তিষ্ক, দেহের সচেষ্ট চট্‌পটে ভাব—প্রচুর সূক্ষ্মদর্শিতা ও অনুভবের তীব্রতা ইত্যাদি লক্ষণে মন-প্রকৃতি সূচিত হয়। এই প্রকৃতিত্রয় সমানভাবে সংমিশ্রিত হইলে দেহ-পঞ্জর যথেষ্ট সবল হয়—অর্থাৎ এতটা বল থাকে না যাহাতে পাশবতা বা পরুষতা উৎপন্ন হইতে পারে। দেহ পুষ্ট থাকে কিন্তু স্থূল হয় না। সুমার্জ্জিত ভাব হয় কিন্তু অপৌরুষিকতা আইসে না। অর্থাৎ তাঁহার দেহ প্রকৃত সুরে বাঁধা সেতারের তিন সপ্তক পর্দার তারের ন্যায় সমানভাবে সুরে বাজিতে থাকে। ডাক্তারের জীবন উদ্বেগ, চিন্তা, শ্রান্তি, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় এবং আত্ম-ত্যাগের সমষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই জন্য তাঁহার এই প্রকার দেহ-প্রকৃতি হওয়া উচিত যাহাতে এই সকল গুণ স্ফূর্ত্তি পাইয়াও তাঁহার দেহকে নষ্ট করিতে পারিবে না। যদি কাহারও মন-প্রকৃতির আতিশয্য থাকে, তাহা হইলে সে সহজে ক্ষয়গ্রস্ত এবং উদ্বিগ্ন চটা-মেজাজ ও অসুখী হয়। যদি বল-প্রকৃতি অতিমাত্রায় থাকে—তাহার মুখাবয়ব কর্কশ ও চুল শক্ত হয়—তাহা হইলে তাহার চরিত্রে

ভদ্রতা, সুনার্জ্জিতভাব ও সুরুচির অভাব হইবে। যদি প্রাণ-প্রকৃতি অতিশয় প্রবল হয়—তাহা হইলে শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্তি চলিয়া যাইবে—অতিরিক্ত পরিমাণে আহার পান করিয়া বুদ্ধি ঘোলাইয়া যাইবে—ব্যবহারেও অভদ্রতা বর্ব্বরতা ইতরামি আসিয়া পড়িবে। চিকিৎসকের শারীরিক প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত উপরে বলা গেল—এক্ষণে কিরূপ মানসিক লক্ষণ তাহার কাজের পক্ষে উপযোগী তাহা বলা যাইতেছে।

প্রথমতঃ তিনি যে জ্ঞানরাশি অর্জ্জন করিবেন তাহা কেজো ধরণের হওয়া আবশ্যক। রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা শারীর বিজ্ঞান, রোগ বিজ্ঞান ইত্যাদি তাঁহার আলোচনীয় বিষয়। এই সকল বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য কপালের অধোভাগ বিলক্ষণ পরিপুষ্ট হওয়া চাই—অর্থাৎ তাঁহার পর্য্যবেক্ষণী বৃত্তিসমূহ থাকা চাই। কপালের উপরের দিক পরিপুষ্ট হইলে যে সকল কাজে মৎলব আঁটা ও ফন্দি খাটানো দরকার সেই সকল কাজ ভাল করা যাইতে পারে কিন্তু ডাক্তার হইতে গেলে নীচের দিকের কপাল পরিপুষ্ট না হইলে আদৌ সফলতা লাভ করা যায় না। ডাক্তারের মেধা ও স্মরণশক্তি প্রবল থাকা চাই। তাঁহার কপালের মধ্যদেশ বিলক্ষণ পরিপুষ্ট হওয়া আবশ্যক। কেন না, তিনি কেতাবে যাহা কিছু পড়িয়াছেন, দেখিয়া শুনিয়া যাহা কিছু তাঁহার অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহা প্রতিপদে কাজে খাটাইতে হইবে। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিও প্রবল থাকা চাই—বিশেষত তুলনা-শক্তি। কপালের উর্দ্ধভাগ বুদ্ধিবৃত্তির স্থান। তুলনাশক্তি প্রবল থাকিলে তিনি বিচার করিয়া রোগের মূল নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। যাহার কেবল পর্য্যবেক্ষণী বৃত্তিগুলিই প্রবল তিনি রোগের ঠিক্ কারণ ধরিতে পারেন না—যাহা একবার একস্থলে দেখিয়াছেন তাহাই হয়তো ভিন্ন অবস্থাতেও

অন্ত স্থলে প্রয়োগ করিবেন—অবস্থার পরিবর্ত্তনে যে প্রয়োগের পরিবর্ত্তন আবশ্যক অনেক সময় তিনি বুঝিতে পারেন না। তাঁহার অভিজ্ঞতার বাহিরে কিছুমাত্র বিচার করিতে সমর্থ হন না। যাঁদের আবার কেবল উপরের দিকের কপাল পরিপুষ্ট তাঁহারা থিয়োরি করিতে পারেন কিন্তু অনেক তথ্য তাঁহারা ঠিক্ ধরিতে পারেন না। এমন অনেক সুযোগ্য চিকিৎসক দেখা গিয়াছে যাঁদের কেবল পরামর্শের জন্ত ডাকা হয়—সমস্ত ঘটনা ও লক্ষণ আনুপূর্ব্বিক তাঁহাদের বলিলে তাহারা তবে বিচার করিয়া ঠিক্ কারণ নির্ণয় করিতে পারেন। তাঁহারা কালেজে বেশ লেক্‌চার দিতে পারিবেন কিন্তু ব্যবহারিক চিকিৎসায় হয়তো তাঁহারা কিছুমাত্র খ্যাতি লাভ করিতে পারিবেন না।

চিকিৎসকের সামাজিক ভাবও বিলক্ষণ থাকা চাই। সেইজন্ত মাথার পশ্চাদ্ভাগ যথেষ্ট পরিপুষ্ট হওয়া আবশ্যক। তিনি যে পরিবারে চিকিৎসা করিবেন সেই পরিবারের আবালবৃদ্ধ সকলেই তাহাকে ভালবাসিবে—তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে—তাঁহাকে দেখিয়া রোগী প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে।

চিকিৎসকের দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভর বিলক্ষণ থাকা চাই; এতটা আত্মাভিমান থাকা চাই যে নিজের স্কন্ধে স্থলবিশেষে সমস্ত ঝুঁকি লইতে পারেন এবং যাহা রোগীর জন্ত ব্যবস্থা দিবেন তাহার উপাদেয়তা সম্বন্ধে নিজের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই।

চিকিৎসকের সাহস ও জেদ্ থাকা আবশ্যক। প্রতিবিধিৎসা ও জিঘাংসা বৃত্তি পরিপুষ্ট হওয়া চাই। তাহা না হইলে তিনি কাটাকুটির কাজে সংকুচিত হইবেন। আসল কথা তাঁহার সিংহের মত নির্ভীক হৃদয় ও স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল হস্ত হওয়া আবশ্যক।

তাঁহার সাবধানতা ও গোপন করিবার শক্তি থাকা চাই। অনেক

সময়ে গোপন করিবার শক্তির অভাবে ডাক্তার রোগীর মুখের সামনেই হয় তো তাহাকে কোন অপ্রিয় কথা বলিয়া তাহাকে নিরাশা-সাগরে মগ্ন করিতে পারেন। তাহাতে রোগের উপসম হওয়া দূরে থাকুক্ তাহাতে তাহার অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়ে।

ডাক্তারের আশা ও হাস্যপ্রিয়তা থাকাও আবশ্যক। যে সকল রোগী রোগের প্রভাবে বিমর্ষ ও অপ্রফুল্ল হইয়া পড়ে ডাক্তার তাহাদিগকে আশার কথা বলিয়া হাস্য পরিহাস করিয়া তাহাদিগকে একটু প্রফুল্ল করিতে পারেন। রোগীর ঘরে গিয়া ডাক্তারও যদি বিষণ্ণভাব প্রদর্শন করেন তাহা হইলে রোগী আরও ভীত হইয়া পড়ে।

চিকিৎসকের হস্তপটুতাও বিলক্ষণ চাই—নহিলে কাটাকুটির কাজে কিম্বা পটিবাঁধার কাজে অদক্ষ হইবেন।

আইন ব্যবসায়ী। "আমি উকিল কিম্বা ব্যারিষ্টার হইব" এক জন হয় তো মনে মনে স্থির করিলেন। কিন্তু উকীল কিম্বা ব্যারিষ্টার হইতে গেলে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক তাহা কি জানা আছে? আইন ব্যবসায়ে যে সকল জ্ঞান অর্জ্জন করা আবশ্যক তাহা কি আয়ত্ত করিতে তুমি সমর্থ হইবে? ঐ ব্যবসায়ে প্রতিপক্ষের নিকট হইতে যে বাধা পাওয়া যায় তাহার উপযুক্ত সাহস তো তোমার আছে—তাহাদের বাক্যবাণের সমক্ষে তুমি তো অক্ষতভাবে উন্নত দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবে? তাহাদের সহিত তর্ক করিতে সমর্থ হইবে তো? আবশ্যকীয় মনে রাখিবার জন্য যথেষ্ট স্মরণশক্তি আছে তো? উপস্থিতমত চট করিয়া কোন কথা ধরিয়া আপনার কাজে লাগাইবার ক্ষমতা তোমার আছে তো?

আইনের মূলতত্ত্ব বুঝিবার মত তোমার দার্শনিক বুদ্ধি আছে তো? যথাযথরূপে তোমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার বাক্‌পটুতা

আছে তো? মানবচরিত্র জ্ঞান তোমার আছে তো?—সাক্ষী, উকীল, ও জুরির মনোভাব চট করিয়া ধরিতে পার তো? একটা কোন আইনের তর্ক মীমাংসা করিবার জন্য রাশি রাশি আইন গ্রন্থ ধৈর্য্য সহকারে হাৎড়াইতে পারিবে তো? তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চলিবে না—কেন না তাহা হইলে তোমার মক্কেলের হানি হইতে পারে—তোমারও মন অবশ হইতে পারে। তোমার সমস্ত মানসিক বৃত্তির সামঞ্জস্য আছে তো? তুমি প্রতিপক্ষের সহিত তর্কে কিম্বা জুরি ও সাক্ষীকে বুঝাইবার সময় সামাজিক, নৈতিক সর্ব্বপ্রকার হৃদয়ভাবের দোহাই দিতে সমর্থ হইবে তো? তোমার কি সেরূপ বিদ্যার জোর আছে যে তুমি বিদ্বানদের মধ্যে সপ্রতিভ হইয়া থাকিতে পারিবে? তোমার কি এতটা স্বাস্থ্য বল আছে যে তুমি ক্রমাগত সাতদিন ধরিয়া অশ্রান্তভাবে বিপক্ষ উকীলের সহিত তর্কবিতর্ক করিতে সমর্থ হইবে?—যখন সকল চোখ, সকল কান তোমার উপর ন্যস্ত তখন তুমি প্রশান্তচিত্তে অটলভাবে সুস্পষ্টরূপে আপনার বক্তব্য কি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে? সকল প্রকার প্রলোভন অতিক্রম করিতে পার এরূপ প্রবল ধর্ম্মবুদ্ধি তোমার কি আছে?—যদি এই সমস্ত গুণ থাকে তবে তুমি এই কাজে অগ্রসর হও। সর্ব্বত্রই দেখা যায় আইনব্যবসায়ী শ্রেণী হইতেই উৎকৃষ্ট রাজনীতিকুশল পুরুষেরা সমুত্থিত হন। আমাদের সভা সমিতিতে রাজদরবারে আইন ব্যবসায়ীদেরই প্রাধান্য দেখা যায়। চৌকোশ লোক না হইলে আইন ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করিতে দেখা যায় না। ক্রমশঃ।

ভ্রমসংশোধন।

৩৪৩ পৃষ্ঠায় "রৌপ্যমুদ্রা" প্রবন্ধের ১১ লাইনে "রৌপ্যের দর বাড়িয়াছে এবং এখনও বাড়িতেছে" না হইয়া "রৌপ্যের দর কমিয়াছে এবং এখনও কমিতেছে" হইবে। "ভারতের দারিদ্র্য ও বাণিজ্য" প্রবন্ধের ৩৭২ পৃষ্ঠায় ৮ম লাইনে "জমিদার" না হইয়া "জামিনদার" হইবে।

সাধনা।

নববর্ষে।

নিশি অবসান প্রায়, ওই পুরাতন
বর্ষ হয় গত।
আমি আজি ধূলিতলে এ জীর্ণ জীবন
করিলাম নত!
বন্ধু হও, শত্রু হও,
যেখানে যে কেহ রও,
ক্ষমা কর আজিকার মত
পুরাতন বরষের সাথে
পুরাতন অপরাধ যত!

আজি বাঁধিতেছি বসি সংকল্প নূতন
অন্তরে আমার,
সংসারে ফিরিয়া গিয়া হয় ত কখন্
ভুলিব আবার!
তখন কঠিন ঘাতে
এনো অশ্রু আঁখিপাতে,
অধমের করিয়ো বিচার!
আজি নব-বরষ প্রভাতে
ভিক্ষা চাহি মার্জ্জনা সবার!

আজি চলে' গেলে' কাল কি হবে না হবে
নাহি জানে কেহ!
আজিকার প্রীতিসুখ রবে কি না রবে,
আজিকার স্নেহ!
যতটুকু আলো আছে
কাল নিবে যায় পাছে
অন্ধকারে ঢেকে যায় গেহ,
আজ এস নববর্ষদিনে
যতটুকু আছে তাই দেহ'।

বিস্তীর্ণ এ বিশ্বভূমি সীমা তার নাই,
কত দেশ আছে,
কোথা হতে কয়জনা হেথা এক ঠাঁই
কেন মিলিয়াছে?
কর সুখী, থাক সুখে,
প্রীতিভরে হাসিমুখে,
পুষ্পগুচ্ছ যেন এক গাছে!
তা' যদি না পার চিরদিন,
একদিন এস তবু কাছে!

সময় ফুরায়ে গেলে, কখন্ আবার
কে যাবে কোথায়!
অনন্তের মাঝখানে পরস্পরে আর
দেখা নাহি যায়!
বড় সুখ বড় ব্যথা
চিহ্ন না রাখিবে কোথা,

মিলাইবে জলবিম্বপ্রায়,
আজি তবে সকলের মুখ
ভাল করে' দেখে' লই, আয়!

আপন সুখের লাগি সংসারের মাঝে
তুলি হাহাকার!
আত্ম-অভিমানে অন্ধ, জীবনের কাজে
আনি অবিচার!
আজি করি প্রাণপণ
করিলাম সমর্পণ
এ জীবনে যা আছে আমার!
তোমরা যা দিবে তাই লব
তার বেশি চাহিব না আর!

লইব আপন করি নিত্য ধৈর্য্যভরে
দুঃখভার যত!
চলিব কঠিন পথে অটল অন্তরে
সাধি মহাব্রত!
যদি ভেঙ্গে যায় পণ,
—দুর্ব্বল এ শ্রান্ত মন,—
সবিনয়ে করি শির নত
তুলি লব আপনার পরে
আপনার অপরাধ যত!

যদি ব্যর্থ হয় প্রাণ, যদি দুঃখ ঘটে,—
ক' দিনের কথা!

একদা মুছিয়া যাবে সংসারের পটে
শূন্য নিষ্ফলতা!
জগতে কি তুমি একা?
চতুর্দ্দিকে যায় দেখা
সুদুর্ভর কত দুঃখ ব্যথা!
তুমি শুধু ক্ষুদ্র একজন,
এ সংসারে অনন্ত জনতা!

যত ক্ষণ আছ হেথা স্থিরদীপ্তি থাক,
তারার মতন।
সুখ যদি নাহি পাও, শান্তি মনে রাখ
করিয়া যতন!
যুদ্ধ করি নিরবধি
বাঁচিতে না পার যদি,
পরাভব করে আক্রমণ,
কেমনে মরিতে হয় তবে
শেখ তাই করি' প্রাণপণ!

জীবনের এই পথ, কে বলিতে পারে
বাকি আছে কত!
মাঝে কত বিঘ্ন শোক, কত ক্ষুরধারে
হৃদয়ের ক্ষত!
পুনর্ব্বার কালি হতে
চলিব সে তপ্ত পথে,
ক্ষমা কর আজিকার মত

পুরাতন বরষের সাথে
পুরাতন অপরাধ যত!

ওই যায়, চলে যায় কাল-পরপারে
মোর পুরাতন!
এই বেলা, ওরে মন, বল্ অশ্রুধারে
কৃতজ্ঞ বচন!
বল্ তারে—দুঃখ সুখ
দিয়েছ ভরিয়া বুক,
চিরকাল রহিবে স্মরণ!
যাহা কিছু লয়ে গেলে সাথে
তোমারে করিনু সমর্পণ!

ওই এল এ জীবনে নূতন প্রভাতে
নূতন বরষ!
মনে করি প্রীতিভরে বাঁধি হাতে হাতে
না পাই সাহস!
নব অতিথিরে তবু
ফিরাইতে নাই কভু,
এস এস, নূতন দিবস!
ভরিলাম পুণ্য অশ্রুজলে
আজিকার মঙ্গল কলস!

ভারতবর্ষে।

বারাণসী।

নাট্য দৃশ্যের হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইল। ২৪ ঘণ্টা উত্তর বাঙ্গলার রেলপথে ও ২১ ঘণ্টা গ্রেট পেনিন্‌সুলার রেলপথে ভ্রমণ করিয়া কাল সন্ধ্যার সময় এখানে পৌছিলাম। পথে কিছুই বিশেষ দেখিবার নাই। মোঙ্গলীয় শীতল (দার্জিলিং) প্রদেশ হইতে নামিয়া একেবারে ভারতের পুণ্যভূমিতে—সনাতনী গঙ্গাদেবীর পুণ্য তটে আসিয়া উপস্থিত।

এইখানেই সেই প্রাচীন ভারতবর্ষ—হিন্দুর ভারতবর্ষ। এখানে য়ুরোপীয়েরা বাস করে না, এখান দিয়া কেবল যাতায়াত করে মাত্র। ইংরাজ ইহার কিছুই পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই; বণিক কিম্বা কারখানাওয়ালা হইয়া ইংরাজেরা এখানে রীতিমত আড্ডা গাড়ে নাই। এই নগরী—এই হিন্দুরা—এই সকল মন্দির দশ শতাব্দি পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। ইহা হিন্দুজগতের হৃদয়-দেশ—সেই অগ্নিস্থান যেখানে ব্রাহ্মণ্য অনল সর্ব্বদাই প্রজ্জলিত রহিয়াছে। সেই পুরাকালের ব্রাহ্মণেরা, যাঁহারা পুত্রের পুত্রমুখ দেখিবার পর ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বিজনে বিশ্বের মূলতত্ত্ব ধ্যান করিতেন, তাঁহারা এই বারাণসী কিম্বা এই গাঙ্গেয় উপত্যকার নিকটবর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসী। এই স্থানেই হিন্দু চিন্তার পরিণামস্বরূপ মহা মহা ছয়টা দর্শন বিরচিত হইয়াছিল। পঞ্চবিংশতি শতাব্দিতেও এই নগর বিখ্যাত ছিল। হাঁ, যখন নিনিভার সহিত ব্যাবিলনের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, যখন টায়ার মধ্যধরাশায়ী সাগরের উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিল, যখন এথেন্স নগরের হাটবাজার বাগ্মীদিগের বাক্যোচ্ছাসে প্রতিধ্বনিত হইত

এবং সেখানকার মন্দিরসকল প্রস্তর-মূর্ত্তিতে পূর্ণ হইতেছিল; যখন রোম, কৃষকদিগের নিবাসস্বরূপ একটি ক্ষুদ্র নগরমাত্র ছিল, যখন পুরাতন মিসরীয় ধর্ম্মমতের প্রাদুর্ভাব ছিল, সেই সময়ে এই প্রখ্যাত মহানগরী আজিকার ন্যায় তখনও গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণে পরিপূর্ণ। তখনও ব্রাহ্মণদিগের যে সকল লক্ষণ ছিল, এখনও তাহাই দেখা যায়; কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের পীড়নে দেহযষ্টি একেবারে নত হইয়া পড়িয়াছে, আপনার মধ্যে আপনি পুঁটুলি বাঁধিয়া আছে, দার্শনিক স্বপ্নদর্শনে নিমগ্ন, চিন্তার সূক্ষ্ম তন্তুজাল আরও সূক্ষ্মতর করিতে করিতে মাথা ঘুরিয়া যাইতেছে খেয়াল দেখিতেছে— তাঁহাদের নিকট এই নীরেট জগৎ স্খলিত গলিত হইয়া এমন একটি প্রশান্ত নাস্তিত্বে পরিণত হইয়াছে,যেখান হইতে অস্তিত্বের প্রতীয়মান আবির্ভাব মাত্র নিরন্তর সমুত্থিত হয়। ইহাদের মধ্যে শাক্যমুনি একজন। এখান হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে ইহাঁর জন্মস্থান এবং পাঁচ বৎসর কাল ধ্যান ধারণার সাধনা করিয়া বারাণসীতে ইনি নিজ মত প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। আজি আমাদের পুরাকালীন পাশ্চাত্যের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। সে জগৎ একেবারেই মৃত—তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে—কালের অন্ধকার তাহাকে একেবারেই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এই কাশী নগর চিরকালই ভারতের সেই মহিমান্বিত কাশীধাম।

প্রভাতে, যখন সূর্য্যমণ্ডল স্পন্দিত হৃদয়ে গঙ্গার পশ্চাতে উদিত হয় তখন পঁচিশ হাজার ব্রাহ্মণ, হিন্দু জনতার সম্মুখে, নদীর তটদেশে উপবিষ্ট হইয়া এখনও তারকার উদ্দেশে, পুণ্য নদীর উদ্দেশে, আদিম শক্তিসমূহের উদ্দেশে, প্রাণের দৃশ্যমান উৎপত্তি-স্থানসমূহের উদ্দেশে, সেই প্রাচীন বৈদিক স্তুতিগান সকল পাঠ করিয়া থাকে। রোম নগর ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের নিকট যত না পবিত্র,

কাশী হিন্দুর নিকট তদপেক্ষা অধিক পবিত্র। উহার প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড পবিত্র। কাশীতে যাহার মৃত্যু হয়, কোনও মলিনতা কোনও পাপই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। খৃষ্টিয়ান হউক, মুসলমান হউক, গোহত্যাই করুক, বা গোমাংসই আহার করুক, সে নিশ্চয়ই কৈলাসধামে—শিবলোকে গমন করে। অতএব সেই ব্যক্তি ভাগ্যবান্ জীবনের শেষ ভাগ যে কাশীতে কাটাইতে পারে। দুই লক্ষেরও অধিক যাত্রী ভারতের সকল দিক্ হইতে এই-খানে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকে বৃদ্ধ ও মৃত-কল্প। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি কাহারও কাশীপ্রাপ্তি না হয়, অন্ততঃ তাহার অন্তিম ভস্মরাশি কাশিধামে পরে পাঠান হয়। এই উদ্দেশে পাঠান হয় যে, গঙ্গাপুত্রেরা অন্ত্যেষ্টি মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহার অন্তিম ভস্ম গঙ্গাদেবীকে সমর্পণ করিবে। হিন্দুরা বলে, 'কাশী—পুণ্যধাম কাশী—কাশীকে ধ্যান করিলেই শান্তিতে মৃত্যু হয়'।

বাস্তবিকই এই নগরটি অসাধারণ। অন্যত্র, ধর্ম্মাচরণ, প্রকাশ্য জীবনের এক অংশমাত্র, কিন্তু কাশীতে ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।. ধর্ম্ম এখানে সমস্ত গ্রাস করিয়া আছে—মানবজীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত পূর্ণ করিয়া আছে—নগরকে মন্দিরে মন্দিরে ছাইয়া ফেলিয়াছে। উনবিংশতি সহস্রেরও অধিক মন্দির, এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবালয় অসংখ্য। মূর্ত্তির সংখ্যা যদি ধর তো সে কাশীর জনসংখ্যার দ্বিগুণ। প্রায় পাঁচ লক্ষ হইবে। কাল সন্ধ্যায় যখন পৌঁছিলাম, দিনের আলো তখনও ছিল, তাই বেড়াইতে বেড়াইতে নদীর ধার পর্য্যন্ত গেলাম। নগরের আঁকা-বাঁকা গলিসকল অর্দ্ধ-নগ্ন মানবকুলের গতিবিধিতে পরিপূর্ণ। দেবালয়ের দ্বারের সম্মুখে লোকের বেশি ভীড়। গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণেরা ঠেলাঠেলি করিয়া চলি-য়াছে; সন্ন্যাসীরা আসন করিয়া উপবিষ্ট—ভস্মমাখা নগ্নদেহ—

স্থির দৃষ্টি—চারিদিকের চঞ্চল গতিবিধির মধ্যে প্রস্তরবৎ অচল।

হল্‌দে ফুলের হার, মালা, প্রস্তরের শিবলিঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ ধর্ম্মোপকরণে এখানকার দোকান সকল পরিপূর্ণ। ঘরের দেয়ালে, দ্বারের উপরিভাগে,কুলঙ্গির উপর,নানাপ্রকার কদাকার দেবমূর্ত্তি—কাহারও বা গজমুণ্ড—কাহারও বা গায়ে সাপ জড়ানো। স্থানে স্থানে কূপ—তাহা হইতে পচা ফুলের দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। সেই সকল কূপে দেবতার বাস—তাহার চারিদিকে লোকের অত্যন্ত ভীড়। প্রাচীরের গায়ে নীলরঙ্গে চিত্রিত হিন্দু দেবদেবীর পৌরাণিক কাহিনী। দেবদেবীর অশ্লীল মূর্ত্তিসকল মালার আকারে মন্দিরের চারিদিকে বেষ্টিত। এত দেবদেবীর মূর্ত্তি যে, বড় বড় মন্দিরেও যেন আর ধরে না—রাস্তার মধ্যে ছোট ছোট দেব-স্থানেও দেবতা-দিগকে আশ্রয় লইতে হইয়াছে—তাহাতে লম্বোদর গণেশ অথবা ভীষণ-মূর্ত্তি কালীদেবী অধিষ্ঠিত। মন্দির বেদীর উপর যে জুঁই ফুল থাকে তাহাতে গঙ্গাজলের ছিটা দেওয়া হয়। এই গঙ্গাজলে ভিজিয়া ভিজিয়া ফুলসকল পচিয়া উঠে—তৎপরে গোবর ও এই পচা ফুলে মিশিয়া একপ্রকার কর্দ্দম উৎপন্ন হয়। এই কর্দ্দমের উপর দিয়া পিছলিয়া পিছলিয়া চলিতেছি—আর দুর্গন্ধ ভোগ করিতেছি। এই মানব-জনতার মধ্যে আবার বানরেরা লাফালাফি করিতেছে—খেলি-তেছে—ঘরের ছাদে বসিয়া আছে; এবং বন্ধন-মুক্ত গাভীসকল ইতস্তত বিচরণ করিয়া ফুল খাইতেছে। প্রাচীন হিন্দু মহাকাব্যে অসংখ্য যুগযুগান্তের কথা, অসংখ্য দেবদেবীর কথা, অসংখ্য জীবজন্তু উদ্ভি-জ্জের কথা পড়িয়া যেমন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতে হয়, এইখানকার ব্যাপারসকল দর্শন করিয়া আমার কতকটা সেই রকম মনের ভাব হইয়াছে। আমাদের স্বাভাবিক মনের গতি ও অভ্যাস যেন একে-

বারে ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। মনে হয় যেন এমন একটা দেশে আসিয়াছি যেখানে মানুষ পায়ে না হাঁটিয়া মাথায় হাঁটে। এই মানবজাতি যেরূপে চিন্তা করে, অনুভব করে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহা সম্পূর্ণ আমাদের বিপরীত—আমাদের ভাবের সঙ্গে আদৌ মিশ খায় না। কাশীতে আসিয়া মনে হয়, যেন খেয়াল দেখাই এখানকার স্বাভাবিক অবস্থা। ··· ··· ··· ···

পাঁচটার সময় উঠিলাম, সাড়ে ছটার সময় নদীর ধারে উপনীত হইলাম। প্রভাতের তরুণ আলোকে দিগন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান তরল রজতবৎ শুভ্রকান্তি। বৃহৎ গঙ্গা নিজ শ্যামল বক্ষ উদ্‌ঘাটন করিয়া, কর্দ্দমময় ভাঙ্গা ভাঙ্গা তরঙ্গলহরী বিস্তার করিয়া দুই কূলের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। একদিকে বালুকাময় বিস্তীর্ণ মরু—আর একদিকে মন্দির প্রাসাদ মসজিদ, মর্ম্মর-প্রস্তরের প্রাচীর—যাহার রেখাসূত্র গোলাবী কুয়াশার গভীরতম দেশে ক্রমশ মিলাইয়া গিয়াছে। ঘাটের প্রশস্ত ধাপসকল উদারভাবে নদী পর্য্যন্ত নামিয়াছে এবং সূর্য্যালোকে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। এইখানে হিন্দুদিগের ভীড়। যাত্রী, পুরোহিত, ভক্তের দল সবাই প্রাভাতিক অর্চ্চনা সমাধা করিবার জন্য—উদীয়মান সূর্য্যকে ও গঙ্গাদেবীকে পূজা দিবার জন্য এখানে সমাগত। সহস্র সহস্র লোক। গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণেরা—ত্রিবলীশোভিত লম্বোদর—দীপ্তিমান মুণ্ডিত মস্তক—বৃহৎ বৃহৎ তৃণাচ্ছাদিত ছত্র-তলে, প্রস্তর-ফলকের উপর উপবিষ্ট হইয়া পথিকদিগের নিকট শাস্ত্র হইতে শ্লোক পাঠ করিতেছে। শ্যামবর্ণ শূদ্রেরা মুণ্ডিতমস্তক, কেবলমাত্র অল্প এক গুচ্ছ কেশ ঘাড়ের দিকে লম্বমান—অর্দ্ধ-নগ্ন চটুল দেহ। স্ত্রীলোকেরা উজ্জ্বল রঙ্গের কাপড়ে আপাদমস্তক আচ্ছাদিত। তাহারা দাঁড়াইয়া সূর্য্যের দিকে বাহু উত্তোলন করিয়া করযোড়ে পূজা করিতেছে। যতই আমাদের নৌকা জলের উপর অগ্রসর হইতে

লাগিল ততই মন্দির ও লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। চারি শত ফুট প্রশস্ত বড় বড় সোপানশ্রেণী প্রকাণ্ড পিরামিডের ন্যায় উর্দ্ধে উঠিয়াছে, তাহাদের সহস্র সহস্র ধাপ—সেই ধাপসমূহের সমান রেখাপাত। গুরুভার অষ্টকোণ স্তম্ভসকল জলমধ্যে নিমগ্ন; হর্ম্ম্য-শ্রেণীর চৌকোনা সম্মুখভাগ—লালপাথরে ফুলকাটা বড় বড় চূড়া—মার্ব্বলের ভিতর খোদা কুলঙ্গি সকল একটার পর একটা দৃষ্টি-পথে আসিতেছে। পুরাতন মিসরের ন্যায়, আসিরিয়ার পৌরাণিক নগরের ন্যায় এখানে পাথরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ, জ্যামিতিক গঠন প্রণালী অনুসারে উপর্য্যুপরি ন্যস্ত। এই সকল অট্টালিকার নিম্নে বহুপুরাতন নদীর ধারে শতসহস্র হিন্দু গতিবিধি করিতেছে—ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছে।

চারি ঘণ্টা ধরিয়া আমি নদীর উপর নৌকা করিয়া যাতায়াত করিলাম—এই সকল অশেষ বিচিত্রতা—আকার ও ভঙ্গীর অনন্ত তরঙ্গ আমি কি করিয়া বর্ণনা করিব? আলোক-ধবল প্রশস্ত ধাপের উপর—বাঁধা পোস্তার ধারে—ভগ্নাবশিষ্ট মন্দিরের রাশীকৃত প্রস্তরের উপর—আরও উচ্চে গবাক্ষের উপর—প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তূপের ছাদে—তৃণময় ছত্রারণ্যের তলে—শ্যামল দেহসকল পিল্‌পিল্ করিতেছে—বিচিত্র রঙ্গের বুদ্বুদ যেন ভাসিতেছে। পাঁচটি নগ্নদেহ একটা থামের উপর হইতে এক লম্ফে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল—জলকণার স্ফুলিঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তাহাদের পশ্চাতে ব্রাহ্মণেরা বিড়্‌বিড়্ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বৃক্ষশাখা আস্ফালন করিয়া জলে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে। আরও নীচে, গম্ভীর ও উন্নতকায় স্ত্রীলোকেরা জল হইতে উঠিতেছে—সিক্ত নীল সাড়ী হইতে টম্‌টস্ করিয়া জল পড়িতেছে। জনতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, লোহিত পট্টবস্ত্রে আবৃত হইয়া, শাস্ত্রানু-

মোদিত আসন রচনা করিয়া, একটা প্রস্তরস্তূপের উপর উপবিষ্ট হইয়া এক ব্যক্তি একদৃষ্টে সূর্য্যের পানে চাহিয়া আছে—কত অদ্ভুত ভঙ্গী ও মুদ্রা করিতেছে, দেখিলে মনে হয় উন্মাদগ্রস্ত; দুইজন স্ত্রীলোক এক হস্তে নাক টিপিয়া ধরিয়া আছে, অপর হস্তে বুক চাপ্‌ড়াইতেছে; একটি বৃদ্ধা একেবারে বক্রীভূত—সর্ব্বাঙ্গ কম্পমান—তাহার গাত্রলগ্ন সিক্ত সাড়ী হইতে তাহার শীর্ণতার রেখা বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে—বলীরেখাঙ্কিত হস্ত যোড় করিয়া সে ছয়বার পাক্ দিয়া ঘুরিতেছে। আর সকলে, ওষ্ঠাধরের দ্রুত স্পন্দন সহকারে, মধ্যে মধ্যে করপুটে জল উঠাইয়া সম্মুখে নিক্ষেপ করিতেছে।

... ...

শিবের নিকট, গণেশের নিকট, সূর্য্যের নিকট, অসংখ্য স্তুতি বন্দনা উত্থিত হইতেছে। একমুহূর্ত্তের জন্য এক একবার সেই গুরুভারাক্রান্ত অভিভূতভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করা যায়, যে ভাব পুরুষানুক্রমে ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইয়া আর্য্য মস্তিষ্কের গঠন পরিবর্ত্তন করিয়া হিন্দুদর্শন ও হিন্দুকাব্যের আকারে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, বিশেষ বিশেষ নশ্বর সত্তার পশ্চাতে একটা মহা শক্তি বিদ্যমান, যে শক্তি সর্ব্বপ্রকার পদার্থ ও সত্তা উৎপাদন করে, যাহা অবিনশ্বর, যাহা অনন্তকাল বর্ত্তমান, সহস্র সহস্র জন্মমৃত্যুর মধ্যে যাহার প্রকাশ এবং যাহার কদাচ ক্ষয় হয় না। এই শক্তিকেই হিন্দুরা পূজা করে—এই শক্তিপূজাই তাহাদের ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি। এই কথাটা যদি একবার উপলব্ধি করা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার অসঙ্গতির ব্যাখ্যা আপনা আপনি হইয়া যায়। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে অসভ্যজাতিসুলভ পৌত্তলিকতার সহিত অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বচিন্তার সম্মিলন হইয়াছে। এই হিন্দুরা তেত্রিশ-

কোটি দেবতা মানে, তা ছাড়া পঞ্চভূত, পশুপক্ষী বৃক্ষ তারকা প্রস্তর সকলকেই পূজা করে। জগদ্ব্রহ্মবাদ—একেশ্বরবাদ—বহুদেববাদ সমস্তই ইহার মধ্যে একাধারে বর্ত্তমান। বিশ্বের সার্ব্বভৌমিক সত্তাকে কিম্বা তাহার বাহ্য প্রকাশকে এক করিয়া দেখ কি বহু করিয়া দেখ, জড়ভাবে দেখ কি আত্মভাবে দেখ—যে ভাবে দেখো তাহারই উপর এই বিশেষ বিশেষ মতবাদ নির্ভর করে। একবার ইহা বুঝিতে পারিলে তাহাদের বাতুল কল্পনার অর্থ পাওয়া যায়, তাহাদের কাব্যগত অদ্ভুত স্বপ্নকাহিনীর ব্যাখ্যা হয়। হিন্দুরা প্রকৃতির মধ্যে মগ্ন হইয়া গিয়া, হস্তী বানর ভল্লুক কীট পতঙ্গ উদ্ভিজ্জ সকলকেই আপনাদের সমকক্ষ সঙ্গী করিয়া লইয়াছে। অধিকন্তু, তাহারা একটা মহাপ্রাণ উপলব্ধি করিয়াছে,যে প্রাণ তরল তরঙ্গময়, যাহা মরিতেছে, জন্মিতেছে, বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যে প্রাণ বিচিত্র ও চিরপরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু যখন আমি এই লোকারণ্যের মধ্যে এই সকল মন্দিরের মধ্যে, মুসলমান মসজিদের দুইটি সমুন্নত সৌধ-ধবল মিনার সুনীল গগনপটে অঙ্কিত দেখিলাম তখন আমার একটা খুব তফাৎ মনে হইল। এই মিনার দুটি গগন ভেদ করিয়া কেমন সিধা উঠিয়াছে। প্রার্থনার ঐকান্তিক আগ্রহ—অন্তরের একটি আকুল ধ্বনি যেন মূর্ত্তিমান হইয়া অপ্রতিহতবেগে ঊর্দ্ধে ছুটিয়াছে। এই মিনারের গঠনে এমন একটি জাতির হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়, যে জাতি অনাড়ম্বরপ্রিয়, ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, একেশ্বরবাদী এবং যাহার হৃদয় প্রবল আবেগে পূর্ণ।

স্বরলিপি।

মিশ্র ভৈরবী—কাওয়ালি লয়।

হেলাফেলা সারা বেলা
এ কি খেলা আপন সনে।
এই বাতাসে ফুলের বাসে
মুখখানি কার পড়ে মনে।
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি
কে জানে গো কাহার হাসি।
দুটি ফোঁটা নয়নসলিল
রেখে যায় এই নয়নকোণে।
কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী
দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন
কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।
সারা দিন গাঁথি গান
কারে চাহে কাঁদে প্রাণ,
তরুতলের ছায়ার মতন
বসে আছি ফুলবনে।

৪।২

॥ {গা মা পা ধা । ঋপ্রা -গা গমপা মা । গা -া -া -া ।
॥ {হে লা ফে লা । সা — রা বে । লা — — — ।

। গমপা মগা রা ন্সা । রা রা পা ঋা । (পধপঋা -পা -মা -গা)া}
। এ কি খে লা । আ প ন্ স । (নে — — —) ।}

। পা -া -া -া । পধা ধা ধা পঞা । ধা ঞা -ধঞর্সা ঞধা ।
। নে — — — । এই বা তা সে । দু লে র্ বা ।

। পাঃ -ধঃ পা -া । সা সা ন্া -সা । রা রা -পা ক্ষা ।
। সে — মু খ্ । খা নি কা র্ । প ড়ে — ম ।

। পধপক্ষা -পা -মা -গা ॥ গা গা পা পা ।
। নে — — — ॥ আঁ খির্ কা ছে ।
। ॥ কোন্ ছা য়া তে ।
। ॥ সা রা দিন্ — ।

। {ধা ধঞা- ধর্সা ঞর্সঞা । ধা -া ধঞাঃ -ধঃ ।
। {বে ড়া য় ভা । সি — কে — ।
। {কো ন্ উ দা । সী দূরে — ।
। {গাঁ থি — গা । — ন্ কা — ।

। পা পধা -পধপা ক্ষা । ক্ষা পা -ক্ষপধা পক্ষা ।
। জা নে — গো । কা হা --র্ হা ।
। — বা জা য় । অ ন -স্ বাঁ ।
। রে চা — হে । কাঁ দে — প্রা ।

। পা -া -া -া । সা রা ক্ষা পা} । ক্ষা ক্ষা ক্ষগা ক্ষা ।
। সি — — — । (আঁ খির্ কা ছে)} । দু টি ফোঁ টা ।
। শী — — — । (কোন্ ছা য়া তে)} । ম নে হয় কার্ ।
। — — — ণ্ । (সা রা দি ন্)} । ত রু ত লের্ ।

। ক্ষা পা -া ক্ষা । পধপক্ষা -পা পা সা ।
। ন য় ন্ স । লি ল্ রে থে ।
। ম নে র্ বে । দ ন্ কেঁ দে ।
। ছা য়া র্ ম । ত ন্ ব সে ।

। -ঃ-রসঃ ন্‌া -া সা । রা রা পা হ্মা । পধপহ্মা -পা -মা -গা ॥
। — যা য় এই । ন য় ন্‌ কো । শে — — — ॥
। — বে ড়া য় । বাঁ শী র্‌ গা । নে — — — ॥
। — আ ছি – । ফু ল — ব । নে — — — ॥

ব্যাখ্যা।

১। এই গানটির তালাঙ্ক ৪।২ ; অর্থাৎ ছেদ-মধ্যবর্ত্তী প্রতি তাল বিভাগের মধ্যে চার চারটি করিয়া মাত্রা আছে ; তাই আকারের বাম দিকে ৪ সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এবং এক-দুই এক-দুই এক-দুই এইরূপ করিয়া ২ সংখ্যা পর্য্যন্ত না থামিয়া এক নিঃশ্বাসে আবৃত্তি করিতে যত সময় লাগে ততটা সময় প্রতিমাত্রার স্থায়িত্ব কাল। তাই আকারের ডাইন দিকে ২ সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

২। হ্ম=কড়ি মা ; ণ=কোমল নি।

৩। া=একমাত্রা ; াঃ=দেড় মাত্রা ; ঃ=অর্দ্ধমাত্রা। দুইটি স্বরের অক্ষর একত্র যোগ করিয়া দ্বিতীয় অক্ষরটির গায়ে অর্দ্ধমাত্রার চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে প্রত্যেক স্বরটি সিকি মাত্রা কাল স্থায়ী।

৪। া-র পূর্ব্বে যখন হাইফেন চিহ্ন না থাকে তখন এক মাত্রা কাল বিরাম অর্থাৎ নীরবতা বুঝাইবে।

৫। সব অন্তরাগুলির একই সুর বলিয়া প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বরলিপি দেওয়া গেল না। প্রথম অন্তরার স্বরলিপি অনুসারে অন্য অন্তরাগুলি পরে পরে গাহিতে হইবে।

নূতন তাম্রশাসন।

মালদহ জেলার অন্তর্গত খালিমপুর নামক গ্রামে বিগত নবেম্বর মাসে আমি এই তাম্রশাসনখানি একটি বিধবা মুসলমান স্ত্রীলোকের গৃহে প্রাপ্ত হই। খালিমপুর গ্রাম প্রাচীন গৌড়নগরের পূর্ব্বদিকে

যে মৃণ্ময় বপ্রশ্রেণী আছে এবং তাহারই অব্যবহিত পূর্ব্বে ভাতিয়ার বিল নামক যে বিল আছে তাহারই পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। গৌড় হইতে ইহার দূরত্ব ন্যূনাধিক ২॥ ক্রোশ হইবে। উপরোক্ত বিধবার মৃতস্বামী আনিম মণ্ডল প্রায় ২।৩ বৎসর হইল একটি ধান্যক্ষেত্রে হল-কর্ষণকালে উক্ত তাম্রশাসনখানি প্রাপ্ত হয়। ধান্যক্ষেত্রটি এক-সময়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর একটি তুতক্ষেত্র ছিল—এবং ইহাতে এক্ষণেও খনন করিলে পুরাতন ইষ্টক পাওয়া যায়। গ্রাম্য লোকেরা অনুমান করে, ঐস্থানে পূর্ব্বে একটি ইষ্টকালয় ছিল। খালিমপুর গ্রামে কেবল মুসলমান কৃষক ও শ্রমজীবিগণের বাস। তাহারা কেহই লেখাপড়া জানে না। আনিম তাম্রশাসনখানি প্রাপ্ত হইয়া দুই একজন দেশীয় পণ্ডিতকে দেখাইয়াছিল—কিন্তু তাঁহারা কেহই পড়িতে পারেন নাই। তদবধি তাহর গৃহে শাসনখানি পড়িয়া ছিল।

তাম্রশাসনের আমি যেরূপ পাঠোদ্ধার করিয়াছি—তাহা শেষভাগে প্রদত্ত হইল।

সম্প্রতি তাম্রশাসনখানি পণ্ডিতগণের দর্শনজন্য এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হইয়াছে। আমি যেরূপ পাঠ উদ্ধার করিয়াছি ইহার দুই এক স্থানে কিঞ্চিৎ ভ্রম থাকিতে পারে; কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, এই পাঠের অধিকাংশই ঠিক।

ইহাতে জানা যায়, রাজা ধর্ম্মপাল—"নারায়ণ ভট্টারক" নামক এক ব্যক্তিকে চারিখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা ধর্ম্মপাল খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে বা ৯ম শতাব্দীর প্রথমভাগে গৌড়ের সম্রাট ছিলেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধন তাঁহার রাজত্বের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল জানা যায়, কেননা যে চারিখানি গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছিল তাহারা পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্ব্বর্ত্তী। পাটলীপুত্র নগর হইতে শাসনখানি জারি হয়।

"নারায়ণ ভট্টারক" আমার বিবেচনায় অপর কেহ নহেন, রাঢ়ীয়

ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে—শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের পূর্ব্বপুরুষ ভট্টনারায়ণ। ভট্ট ও ভট্টারক একই শব্দ। ধর্ম্মপালের বংশে নারায়ণ পাল নামক রাজার প্রদত্ত তাম্রশাসনে—যাহার প্রতিলিপি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Indo-Aryans Vol 2nd গ্রন্থে ২৬৭-২৭০ পত্রে প্রদত্ত হইয়াছে—শিবভট্ট নামক ব্যক্তিও শিবভট্টারক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন দেখা যায়। ভট্ট শব্দেরই গৌরবসূচক আকার ভট্টারক।—ভট্টনারায়ণ গৌরবের সহিত "নারায়ণ ভট্টারক" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধে অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতসমাজে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন ঘটকদের মতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়ে আনীত হয়েন তন্মধ্যে যিনি শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় তাঁহার নাম আদৌ ভট্টনারায়ণ নহে, তাঁহার নাম ক্ষিতীশ। ক্ষিতীশের সহিত ভট্টনারায়ণের সম্বন্ধ কি তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণয় হয় নাই।—ফলত ভট্টনারায়ণ যে আদিশূরের সময়ে এদেশে আইসেন নাই—তাহা প্রাচীন ঘটকদের গ্রন্থে স্পষ্ট প্রমাণ হয়।—তাহার পর "লাহিড়ী বংশাবলী" নামক একখানি গ্রন্থ বরেন্দ্র দেশে থাকা জানা যায়।—শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র মজুমদার রচিত "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থে উক্ত পুস্তকের উল্লেখ আছে। এবং তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে—তাহা এইরূপ—

শুষ্কোৎফুল্লাস্যপদ্মে স্ফুরতি সচকিতং বেদবেদাঙ্গবাণী—
মানী কোদণ্ডপাণিঃ পবনগতিহরঃ কৌক্ষিকোষ্ণীষমৌলিঃ।
কণ্ঠে শ্রীশৈলচক্রং মলয়জতিলকৈরেতি কোলাঞ্চদেশাৎ
সাক্ষান্নারায়ণশ্রীঃ সনিজপরিকরৈর্ভট্টনারায়ণোঽয়ং॥
রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখসুরধুনীতীরদেশে বিধাতুং
নায়াদিগাঞী বিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণঞ্চ।

যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকনকরজতৈর্ধাম সারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রজাতানাং বরেন্দ্রেঽসৌ দ্বিজন্মনাং।
আদিস্ততোজয়মনি র্ভট্টো জজ্ঞে তু নন্দনঃ॥

তাহার পর এই বংশাবলীর বর্ণনায় জানা যায় ভট্টনারায়ণের অধস্তন ১৪শ পুরুষ পীতাম্বর লাহিড়ী। ইনি লাহিড়ীদের আদি পুরুষ। বল্লালসেনের সময়ে ইনি জীবিত ছিলেন।

পীতাম্বর লাহিড়ীকে ১১৫০ খৃঃ অব্দে জীবিত ধরিয়া এবং প্রত্যেক পুরুষ ২৫ বৎসর ধরিলে ১৪শ পুরুষে ৩৫০ বৎসর লব্ধ হয়। তাহা হইলে ন্যূনাধিক খৃষ্টীয় ৮০০ বৎসরে ভট্টনারায়ণ এ দেশে যে আইসেন তাহা এই গ্রন্থের দ্বারা প্রমাণ হয়।—

এই গ্রন্থ ও তাম্রশাসনের প্রমাণ ঐক্য করিলে জানা যায় রাজা ধর্ম্মপাল, ভট্টনারায়ণ ও তৎপুত্র আদিগাঞী ওঝা উভয়কেই ভূমিদান করিয়া এ দেশে বাস করাইয়াছিলেন।

আমি যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে পণ্ডিত সমাজে এই অতি বিচিত্র কথার আলোচনা ও মীমাংসা আবশ্যক।

বারান্তরে সবিস্তার এই কথার আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

প্রতিলিপি।

শ্রীমান্ ধর্ম্মপাল দেবঃ।

স্বস্তি।—

সর্ব্বজ্ঞতাং শ্রিয়মিব স্থিরমাস্থিতস্ত
বজ্রাসনস্য বহুমারকুলোপলস্তাঃ।

দেব্যা মহাকরুণয়া পরিপালিতানি
রক্ষন্তু বো দশবলানি দিশোজয়ন্তি ॥

শ্রিয়ইব সুভগায়াঃ সপ্তভোবারিরাশি-
শশধরইব ভাসো বিশ্বমাহ্লাদয়ন্ত্যাঃ।
প্রকৃতিরবনিপানাং সম্মতে রুত্তনাম্না
সজনি দয়িতবিষ্ণুঃ সর্ব্ববিদ্যারদাতঃ ॥

আসীদাসাগরান্তোর্ব্বীং
গুর্ব্বীভিঃ কীর্ত্তিভিঃ কৃতী।
মণ্ডয়ন্ শমিতারাতিঃ
শ্লাঘ্যঃ শ্রীব প্যটস্ততঃ ॥

মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্যাঃ করগ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশশিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ।
যস্যানুক্রিয়তে সনাতনযশোরাশির্দিশামাশয়ে
শ্বেতিম্না যদি পৌর্ণমাসরজনী জ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া ॥

শীতাংশোরিব রোহিণী হুতভুজঃ স্বাহেব তেজোনিধেঃ
শর্ব্বাণীব শিবস্য গুহ্যকপতের্ভদ্রেব ভদ্রাত্মজা।
পৌলোমীব পুরন্দরস্য দয়িতা শ্রীদেদ্দদেবীত্যভূদ্
দেবী তস্য বিনোদভূর্ম্মরিপোর্লক্ষ্মীরিব ক্ষ্মাপতেঃ ॥

তাভ্যাং শ্রীধর্ম্মপালঃ সমজনি সুজনস্তূপমানাবদানঃ
স্বামী ভূমীপতীনামখিলবসুমতীমণ্ডলং শাসদেকঃ।

চত্বারস্তীর মজ্জৎকরিগণচরণক্ষুণ্ণমুদ্রাঃ সমুদ্রা
যাত্রাং যস্য ক্ষমন্তে ন ভুবনপরিখা বিশ্বগাশাজিগীষোঃ ॥

যস্মিন্নুদ্দামলীলচলিতবলভরে দিগ্জয়ায় প্রবৃত্তে
যান্ত্যাস্তিন্নেয়োধরায়াং চলিতগিরিতিরশ্চীনতাং তদ্বশেন।
ভারাভুগ্নাবমজ্জন্মণিবিধুরশিরশ্চক্রসাহায়কারং
শেষেণোদস্তদোষ্ণা ত্বরিততরমধোধস্তমেবাভুবাতম্ ॥

যৎপ্রস্থানে প্রচলিতবলাস্ফালনাদুল্ললন্তি
র্ধূলীপূরৈঃ পিহিতসকলব্যোমভির্ভূতধাত্র্যাঃ।
সম্প্রাপ্তায়াঃ পরমতনুতাং চক্রবালং ফণানাং।
মগ্নোন্মীলন্মণি ফণিপতে র্লাঘবাদুল্ললাস ॥

বিরুদ্ধবিষয়ক্ষোভাদ্
যস্য কোপাগ্নিরৌর্ব্ববৎ।
অনির্বৃতি প্রজজ্বাল
চতুরম্ভোধিবারিতঃ ॥

যেঽভূবন্ পৃথুরামরাঘবনলপ্রায়াধরিত্রীভুজ
স্তানেকত্র দিদৃক্ষুণেব নিক্ষিতান্ সর্ব্বান্ সমম্ বেধসা।
ধ্বস্তাশেষনরেন্দ্রমানমহিমা শ্রীধর্ম্মপালঃ কলৌ
লোলশ্রীকরিণীনিবন্ধনমহাস্তম্ভঃ সমুত্তম্ভিতঃ ॥

যাসাং নাসীরধূলীধবলদশদিশাং দ্রাগপঞ্চন্নিরস্তাং
ধত্তেমান্ধাতৃ সৈন্য ব্যতিকরচকিতো ধ্যানতন্দ্রীং মহেন্দ্রঃ।

তাসামদ্যাহবেচ্ছাপুলকিতবপুষাম্ বাহিনীনামিধাতুং
সাহায্যং যস্য বাহ্বো নিখিলরিপুকুলধ্বংসিনোর্নাবকাশঃ ॥

ভোজৈর্মৎস্যৈঃ সমুদ্রৈঃ কুরুযদুযবনাবন্তিগন্ধারকীরৈ
র্ভূপৈর্ব্যালোলমৌলিপ্রণতিপরিণতৈঃ সাধুসঙ্কীর্য্যমানঃ।
হৃষ্যৎপাঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃতকনকময়স্বাভিষেকোদকুম্ভো
দত্তঃ শ্রীকণ্ঠকুব্জ স্সললিত চলিত ভ্রূলতালক্ষ্ম যেন ॥

গোপৈঃ সীম্নিবনেচরৈর্ব্বনভুবি গ্রামোপকণ্ঠেজনৈঃ
ক্রীড়দ্ভিঃ প্রতিচত্বরং শিশুগণৈঃ প্রত্যাপন স্থানপৈঃ।
লীলাবেশ্মনি পঞ্জরোদরশুকৈরুদ্গীতমাত্মস্তবং
যস্যা কর্ণয়ত স্ত্রাপা বিচলিতা নম্রং সদৈবাননং ॥

সখলু ভাগীরথী পথপ্রবর্ত্তমান নানাবিধ নৌবাটক সম্পাদিত সেতুবন্ধ-বিহিত-শৈলশিখরশ্রেণি-বিভ্রমাৎ-নিরতিশয়-ঘন-ঘনাঘন-ঘটা শ্যামায়মান-বাসর-লক্ষ্মীসমারব্ধসন্নতজলদ-সময়সন্দেহাৎ—উদীচীনানেকনরপতি-প্রাভৃতীকৃতাপ্রমেয়হয়বাহিনীখরখুরোৎখাত ধূলিধূসরিতদিগন্তরালাৎ—পরমেশ্বরসেবাসমায়াতসমস্তজম্বুদ্বীপভূপালানন্তপাদাতভরণমদবনেঃ—পাটলীপুত্রসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ—

পরমসৌগতো মহারাজাধিরাজশ্রীগোপালদেব পাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরম ভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মপাল দেবঃ কুশলী ॥

শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল সম্বদ্ধ মহন্তাপ্রকাশ বিষয়ে ক্রৌঞ্চশ্বভ্রোনাম গ্রামোহস্যচ সীমা পশ্চিমেন গহিনিকা।

উত্তরেণ কাদম্বরী দেব কুলিকা খর্জ্জুর বৃক্ষশ্চ। পূর্ব্বোত্তরেণ রাজ-পুত্র দেবট কৃতালিঃ। বীজপূরকং গত্বা প্রবিষ্টা। পূর্ব্বেণ—বিট-কালিঃ খাতকযানিকাং গত্বা প্রবিষ্টা। জম্বুযানিকামাক্রম্য জম্বু-যানকং গতা। ততো নিস্বৃত্য নলচম্পোত্তরান্তং গতা। নল * * টাং দক্ষিণেন নামুণ্ডিকায়িকে * * * * * * * * * * * খণ্ড মুখ্যাচ মন্না বিল্বিকা বেদ বিল্বিকান্তা * রোহিত বাটিঃ পণ্ডার বিটি কোটিকা সীমা * * * জোটস্য দক্ষিণান্তঃ গ্রাম বিল্বস্যচ দক্ষিণান্তঃ। দেবিকা সীমা বিটি। ধর্ম্মজা যোটিকা এবম্মাঠা।

শাম্ব্রলী নাম গ্রামঃ অস্য চোত্তরেণ গহিনিকা সীমা ততঃ পূর্ব্বে-ণার্দ্ধ শ্রোতিকয়া আম্রযান কোলর্দ্ধ যানিকং গতঃ ততোপি দক্ষিণেন কালিকা শ্বভ্রঃ অতো নিস্বৃত্য শ্রীবলভিপুকং যাবৎ পশ্চিমেন ততোপি বিল্বস্যোর্দ্ধ শ্রোতিকয়া গহিনিকাং প্রবিষ্টা।

পলিতকে সীমা দক্ষিণেন কাণা দ্বীপিকা পূর্ব্বেণ কৌণ্ডিযা শ্রোতঃ উত্তরেণ গহিনিকা। পশ্চিমেন জৈনস্থায়িকা। এতদগ্রাম সংপারীণ পরকর্ম্ম * দ্বীপং।

স্থালীককট বিষয় সম্বদ্ধ পূথণ্ডিকা মণ্ডলান্তঃপাতি গোপিপ্পলী গ্রামস্ত সীমা। পূর্ব্বেণ উড্রগ্রাম মণ্ডল পশ্চিম সীমা। দক্ষিণেন জোলকঃ পশ্চিমেন বৈসানিকাখ্যা খাটিকা। উত্তরেণোড্রগ্রাম মণ্ডল সীমা ব্যবস্থিতো গোমার্গঃ। —

এষু চতুর্ষু গ্রামেষু সমুপাগতান্ সর্ব্বানেব রাজরাজনক রাজপুত্র রাজামাত্য সেনাপতি বিষয়পতি ভোগপতি ষষ্ঠাধিকৃত দণ্ডশক্তি দণ্ড-পাশিক চৌরোদ্ধরণিক দোস্সাধ সাধনিক দূতখোল গমাগমিকাভিত্বর মানহস্ত্যশ্বগোমহিষ্যজাবিকাধ্যক্ষ নাকাধ্যক্ষ বলাধ্যক্ষ তরিক শৌল্কিক গৌল্মিক তদাযুক্তক বিনিযুক্তকাদি রাজপাদোপজীবিনোঽন্যাংশ্চাকীর্ত্তিতান্ চাট ভট জাতীয়ান্ যথাকালাধ্যাসিনো জ্যেষ্ঠ কায়স্থ

মহামহত্তর মহাত্তর দাশগ্রামিকাদি বিষয় ব্যবহারিণঃ সকরণান্ প্রতিবাসিনঃ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বকং যথার্হং মানয়তি-বোধয়তি-সমাজ্ঞাপয়তি চ।

মতমস্তু ভবতাং।

মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্ম্মণা দূতক যুবরাজ শ্রীত্রিভুবন পাল মুখেন বয়মেবম্ বিজ্ঞাপিতাঃ যথাঽস্মাভির্ম্মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে শুভস্থল্যান্ দেবকুলং কারিতস্তত্র প্রতিষ্ঠাপিতভগবন্নু ন।

নারায়ণ ভট্টারকায় তৎপ্রতিপালকলাট দ্বিজদেবার্চ্চকাদি পাদমূল সমেতায় পূজোপ স্থানাদি কর্ম্মণে চতুর গ্রামান্ অত্রত্য হট্টিকা তলবাটক সমেতান্ দদাতু দেব ইতি।

ততোঽস্মাভিস্তদীয় বিজ্ঞপ্ত্যা এতে উপরে লিখিতকাশ্চত্বারো গ্রামাস্তলবাটকহট্টিকা সমেতাঃ স্বসীমা পর্য্যন্তাঃ সোদ্দেশোঃ সদশাপচারাঃ অকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যাঃ। পরিহৃত সর্ব্বপীড়াঃ ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়েন চন্দ্রার্কক্ষিতি সমকালং তথৈব প্রতিষ্ঠাপিতাঃ।

যতোভবদ্ভি সৃসর্ব্বৈরেব ভূমের্দানফল গৌরবাদপহরণে চ মহানরক পাতাদিভয়াৎ দানমিদমনুমোদ্য পরিপালনীয়ং। প্রতিবাসিভিঃ ক্ষেত্রকরৈশ্চাজ্ঞাশ্রবণবিধেয়ৈ ভূত্বা সমুচিত করপিণ্ডকাদি সর্ব্ব প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য্য ইতি।

বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদাভূমিস্তস্য তস্য তদাফলং॥
ষাষ্টিবর্ষ সহস্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ।
আক্ষেপ্তা চানুমন্তাচ তান্যেব নরকে বসেৎ॥
স্বদত্তাম্পরদত্তাম্বা যোহরেত বসুন্ধরাম্।
সবিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥

ইতিকমলদলাম্বুবিন্দুলোলাঃ
শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা
নহিপুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়োবিলোপ্যাঃ ॥

তড়িত্তুল্যালক্ষ্মী তনুরপি চ দীপানলসমা
ভবোদুঃখৈকান্তঃ পরকৃতিমকীর্ত্তিঃ ক্ষপয়তাং।
যশশ্চাচন্দ্রার্কং নিয়তমবতামত্র চ নৃপাঃ
করিষ্যন্তে বুদ্ধা যদভিরুচিতং কিম্প্রবচনৈঃ ॥

অভিবর্দ্ধমান বিজয় রাজ্যে সম্বৎ ৩২ মার্গ দ্দিনানি ১২ ॥
শ্রীভোগটস্য পৌত্রেণ শ্রীমৎ সুভটসূনুনা।
শ্রীমতাতাতটেনেদং উৎকীর্ণং গুণশালিনা ॥

বৃত্তিনির্ব্বাচন।

আইন ব্যবসায়ীদিগের প্রবল স্মৃতিশক্তি থাকা চাই—কারণ, মোকদ্দমার সময় উপস্থিতমত তাহাদিগকে নজির দেখাইতে হয়। প্রবল তুলনা-শক্তি থাকা চাই, যাহাতে করিয়া তাহারা আইনের বিভিন্ন অংশ ও প্রমাণ তুলনা করিয়া দেখিতে পারে, বিচার করিতে পারে, জেরা করিতে পারে, দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারে এবং সদৃশ মোকদ্দমার কথা উত্থাপন করিতে পারে; এবং বিপুল ভাষা-শক্তি থাকা চাই, যাহাতে করিয়া অনর্গল কথা যোগাইতে পারে।

৩। এঞ্জিনিয়ার। এঞ্জিনিয়ারের গণিত বিদ্যায় স্বাভাবিক

ক্ষমতা, নির্ম্মাণ-পটুতা, স্থাননির্ণয়শক্তি, বস্তুপার্থক্যবোধ, তুলনা-শক্তি, অর্জ্জন-স্পৃহা, সাবধানতা, একাগ্রতা থাকা আবশ্যক এবং তাহার দৈহিক প্রকৃতি প্রাণ-প্রধান অপেক্ষা বল-প্রধান হইলে ভাল হয়। অর্থাৎ মেদ মাংস অপেক্ষা তাহার দেহে অস্থি ও পেশীর প্রাবল্য থাকা আবশ্যক। কেন না, তাহার যে কাজ তাহাতে শ্রমসহিষ্ণুতা নিতান্ত প্রয়োজন।

আমাদের দেশে সুশিক্ষিত যুবকেরা উপরিউক্ত তিন কাজের মধ্যে একটা না একটা সচরাচর অবলম্বন করিয়া থাকেন। যদিও অনেকগুলি মানসিকবৃত্তি এই তিন কাজেরই উপযোগী, তথাপি দুই একটি মানসিক বৃত্তি এই প্রত্যেক কাজে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজনীয়;—এমন কি, না থাকিলে চলে না। তিনজন বালক যদি কর্ম্ম নির্ব্বাচনের পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্ত তোমার নিকট আইসে আর যদি তাহাদের মানসিক বৃত্তি সকলেরই প্রায় সমান হয়—তাহা হইলে যাহার কপালের উপরের অংশ অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট তাহাকে আইনের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে, যাহার কপালের নিম্নস্থ দেশ অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট তাহাকে ডাক্তারি কাজ শিক্ষা করিতে পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে এবং যাহার পাশের কপাল প্রশস্ত তাহাকে ইঞ্জিনিয়ার কাজে প্রবেশ করিতে পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের বিবিধ বিভাগ আছে—তন্মধ্যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ও যান্ত্রিক ইঞ্জিনিয়ার প্রধান। রেলওএ খাল বাঁধ সুড়ঙ্গ পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি স্থায়ী ব্যাপার সকল সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অন্তর্ভূত এবং কলকারখানা ও জাহাজ প্রভৃতির কল চালানো অথবা তাহার তত্ত্বাবধান করা যান্ত্রিক ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য। এই বিশেষ বিশেষ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের বিশেষত্ব অনুসারে ব্যক্তি-

বিশেষের যোগ্যতা পরীক্ষা করা আবশ্যক। তবে, সাধারণতঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের কেন্দ্রস্থল হ'চ্চে নির্ম্মাণ-কুশলতা বা হস্ত-পটুতা। এইটি না থাকিলেই নয়।

যাহার আকৃতিবোধ আছে সে আঁকিতে পারে, যাহার তুলনা ও কার্য্যকারণ জ্ঞান আছে সে একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি হইতে পারে—কিন্তু তাই বলিয়া সে ইঞ্জিনিয়ার না হইতেও পারে। তবে, নির্ম্মাণ-কুশলতার সহিত অধিকন্তু যদি এই বৃত্তিগুলি থাকে তাহা হইলে সে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ আরও ভাল করিয়া চালাইতে পারিবে সন্দেহ নাই। এঞ্জিনিয়ারের গণিত বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া আবশ্যক। আকৃতিবোধ, বিস্তৃতিবোধ, ভারবোধ, কার্য্যকারণ ও তুলনাশক্তি প্রবল থাকিলে গণিত বিদ্যায় সফলতা লাভ করা যায়। ইঞ্জিনিয়ারের ভূপরিমাপের কাজ অভ্যাস করা চাই, ইহাতে পর্য্যবেক্ষণী বৃত্তিসমূহ ও হস্তপটুতার আবশ্যক হয়। ইঞ্জিনিয়ারের ভাষাশক্তি না থাকিলেও কোন হানি নাই।

পত্রিকা-সম্পাদক। পত্রিকা-সম্পাদকদিগের প্রবল পর্য্যবেক্ষণী শক্তি ও স্মৃতিশক্তি থাকা চাই, যাহাতে করিয়া ঘটনা, তথ্য, সংবাদ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিতে পারে। সম্পাদকের তেজো ভাব থাকা চাই। প্রবল তুলনা-শক্তি চাই, যাহাতে করিয়া প্রসঙ্গ সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারে, সকল বিষয়ের দোষগুণ সমালোচনা করিতে পারে—ভুল ধরিতে পারে ইত্যাদি। তেজস্বী হইবার জন্য প্রবল প্রতিবিধিৎসা বৃত্তি থাকা আবশ্যক। তাহাদের লেখায় যাহাতে কথার অভাব না হয়, সহজ, মস্লাদার ও সরস ভাষা হয় এই জন্য তাহাদের ভাষাশক্তি প্রবল থাকা চাই। এবং সুরুচি ও উন্নতভাবের জন্য ভাবুকতা থাকা আবশ্যক।

ব্যবসাদার। কাজ করিতে প্রবৃত্তি দিবার জন্য ব্যবসাদারদিগের

অর্জনস্পৃহা থাকা চাই। সাহসের কাজে প্রবৃত্ত করিবার জন্য প্রচুর আশাবৃত্তি থাকা চাই; নিরাপদ হইবার জন্য সাবধানতা থাকা চাই। মাল সকল ঠিক্ করিয়া চিনিবার জন্য প্রচুর পর্য্যবেক্ষণী বৃত্তি থাকা চাই। যথাযথরূপে ও তাড়াতাড়ি হিসাব করিবার জন্য গননা শক্তি প্রবল থাকা চাই। লোকের নিকট ভদ্র ও বিনয়ী হইবার জন্য লোকাদরপ্রিয়তা থাকা চাই এবং খরিদ্দারদিগের সহিত বন্ধুতা করিবার জন্য আসঙ্গলিপ্সা থাকা চাই। একজন ভাল কেনাবেচা করিতে পারে, একজন পারে না কেন? ইহার উত্তর উভয়ের প্রকৃতির অন্তরেই পাওয়া যায়।

মিস্ত্রী। যন্ত্র ব্যবহার করা যাহাদিগের কাজ তাহাদিগের দৈহিক প্রকৃতি খুব মজ্‌বুৎ হওয়া চাই—যাহাতে করিয়া তাহারা বল-সাপেক্ষ শ্রমসাধ্য কাজ অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে; হস্তপটুতা ও অনুকরণ-শক্তি বিলক্ষণ থাকা চাই, যাহাতে করিয়া দক্ষতার সহিত যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারে—নমুনা দেখিয়া কাজ করিতে পারে। এবং প্রচুর পর্য্যবেক্ষণীশক্তি থাকা চাই যাহাতে করিয়া জিনিসের ভালমন্দ ও উপযোগিতা শীঘ্র বুঝিতে পারে।

চারুশিল্পী। কলাবিৎ চারুশিল্পীদিগের ভাবুকতা প্রবল থাকা চাই, যাহাতে করিয়া তাহারা সৌন্দর্য্যের নিয়ম ও সুরুচির নিয়ম সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারে। এবং মার্জ্জিত সূক্ষ্মভাব ও কাল্পনিক বিষয় সকল সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। হস্তপটুতা থাকা চাই যাহাতে করিয়া শিল্পবিশেষের উপযোগী যন্ত্র দক্ষতার সহিত ব্যবহার করিতে পারে। অনুকরণশক্তি থাকা চাই, যাহাতে করিয়া ভাল নকল তুলিতে পারে—এবং পর্য্যবেক্ষণীশক্তি প্রচুর থাকা চাই যাহাতে করিয়া দ্রব্যের ভাল মন্দ ও আকার প্রকার ঠিক্ বুঝিতে পারে।

শিক্ষক। শিক্ষকের সচেষ্ট মস্তিষ্ক হইবে—কপালের নিম্নভাগ

পরিপুষ্ট হইবে—বড় বড় চোখ হইবে—স্মৃতিশক্তি প্রবল থাকিবে—দয়া সাহস আত্মনির্ভর থাকিবে এবং শিশুদের প্রতি বাৎসল্য থাকিবে।

কোন্ কোন্ মানসিক বৃত্তি,কোন্ কোন্ কাজের উপযোগী উপরে সংক্ষেপে ব্যক্ত করা গেল। এই সকল বৃত্তি মস্তকের কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থিত এবং ইহাদের ফলাফল কি "লোকচেনা" প্রবন্ধে পাঠকেরা সময়ান্তরে অবগত হইতে পারিবেন।

আপাততঃ,বল-প্রকৃতি, প্রাণ-প্রকৃতি ও মন-প্রকৃতি এই প্রকৃতি-ত্রয়ের মধ্যে কোন্ প্রকৃতি কোন্ কোন্ কাজের উপযোগী তাহাই একটু বিস্তৃতভাবে বলা যাইতেছে।

প্রথমতঃ বল-প্রকৃতি যাহাকে ইংরাজি ফ্রেনলজির ভাষায় মোটিভ টেম্পারেমেণ্ট বলে। এই প্রকার প্রকৃতি হইলে দেহের অস্থি মোটা ও লম্বা হয়, মাংসপেশী ঘন, শক্ত ও তারের ন্যায় পাকানো হয়। ইহাতে দেহের বল, সহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতা উৎপন্ন হয়। যাহার বল-প্রকৃতি সে শ্রমসাধ্য কাজ করিতে ভালবাসে। কামার, ছুতার কৃষক, খনক, সৈনিক, নাবিক প্রভৃতি অধিকাংশ শ্রমজীবীরা এই প্রকৃতির লোক। এই প্রকৃতির লোকেরা নূতন দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিবার উপযুক্ত। যেখানে কঠিন পরিশ্রমের দরকার, বড়বড় বাধা যেখানে অতিক্রম করিতে হইবে, যেখানে বিপদের আশঙ্কা আছে—যেখানে সাহস উদ্যম অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, সেইখানেই এই প্রকৃতির লোককে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। অতএব যাহাদের বল-প্রকৃতি, তাঁহারা লৌহকার, প্রস্তরকার, কর্ম্মকার, নৌগঠনকার, ছুতার প্রভৃতির কাজে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা সফলতা লাভ করিতে পারে। আবার, এই প্রকৃতির লোকেরা যদি সুশিক্ষিত হয় তাহা হইলে শ্রমজীবী অপেক্ষা উচ্চতর কাজে নিযুক্ত

হইতে পারে। তাহারা শুধু যে দৈহিক শ্রম করিতে পারে তাহা নহে, মানসিক শ্রমেও তাহারা কাতর হয় না। তাহারা প্রভু হইয়া শ্রমজীবীদিগকে খাটাইতে পারে। তাহারা দেশ আবিষ্কারক, নবদেশানুসন্ধায়ী—জাহাজ পরিচালক নাবিক্—রেলপথের নির্ম্মাতা রেলপথের তত্বাবধারক হইতে পারে। রাজনৈতিক বিপ্লবের সময়, অরাজকতার সময় ইহারাই অনেক সময়ে বিদ্রোহের প্রবর্ত্তক ও নেতা হইয়া উঠে।

আইন, ডাক্তারি পাদ্রিগিরি এই সকল বিদ্যা-ব্যবসায়েও কথন কথন এই প্রকৃতির লোকদিগকে সফল হইতে দেখা যায়—কিন্তু সাধারণতঃ আফিস আদালৎ বিদ্যালয় অপেক্ষা মাঠ ময়দান রাস্তা ঘাটই ইহাদের উপযোগী কর্ম্মক্ষেত্র। যে পাদ্রির বল-প্রকৃতি, তাহার দেশ বিদেশে প্রচারক হইয়া বেড়ান উচিত।

দ্বিতীয়ত প্রাণ-প্রকৃতি। ফ্রেণলজির ভাষায় ইংরাজিতে যাহাকে ভাইটাল টেম্পারেমেণ্ট বলে। বল-প্রকৃতিতে যেমন অস্থি, পেশী প্রভৃতির প্রাধান্য, প্রাণ-প্রকৃতিতে সেইরূপ মেদমাংসের প্রাধান্য। এক্ষণে দেখা যাক্, হৃষ্টপুষ্ট গোল-গাল মোটা-সোটা প্রাণ-প্রকৃতির লোকেরা কিরূপ কাজের উপযুক্ত। প্রাণ-প্রকৃতির লোকের জীবন উৎসাহ আবেগ উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ, তাহারা মুক্ত বায়ুতে বহির্দ্দেশে কাজকর্ম্ম করিতে ভালবাসে এবং কিসে আরামে থাকিতে পারে সর্ব্বদাই তাহার চেষ্টা করে; তাহাদের কেজো সহজ বুদ্ধি। মানুষ দেখিলেই তাহারা চিনিতে পারে ও দ্রব্যের ভাল মন্দ সহজে ধরিতে পারে। তাহারা খুব চতুর, দ্রুত-বুদ্ধি, উপায়জ্ঞ, প্রত্যুৎপন্নমতি ও চৌকোশ হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের চিন্তায় গভীরতা নাই—যথাযথরূপে, পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া তাহারা জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারে না, তাহাদের স্থৈর্য্য ও অধ্যবসায়ও কম; তাহারা

ঝোঁকের মাথায় কাজ করে ও তাহাদের মনের আবেগ অত্যন্ত প্রবল; কর্ত্তব্য অপেক্ষা আমোদের দিকে তাহাদের অধিক টান্ এবং শ্রমসাধ্য কাজ করিতে তাহাদের ভাল লাগে না।

এই প্রকৃতির লোক সেই সকল কাজ করিতে পারে যাহাতে বদ্ধভাব নাই, যাহাতে ক্রমাগত লাগিয়া থাকিতে হয় না, যাহাতে দৈহিক কিম্বা মানসিক শ্রমের আতিশয্য নাই। তাহাদের অর্জ্জন-স্পৃহা ও বিষয়-বুদ্ধি প্রবল; সুতরাং তাহারা ব্যবসা কাজের বেশ উপযুক্ত। তবে,এক জায়গায় বদ্ধ হইয়া নিছক্ খাটুনির কাজ তাহারা করিতে পারে না – কেরাণীর দ্বারা সে-সব কাজ তাহাদের করিয়া লইতে হয়। তাহারা জানে কি করিয়া হোটেলের কাজ চালা-ইতে হয়—তাহারা বিবিধ ব্যবসায়ে ও কাজকর্ম্মে কনট্রাক্টর, এজেণ্ট ও তত্ত্বাবধারক হইতে পারে—রাজনৈতিক ব্যাপারে কিম্বা আফিসের কাজেও তাহারা নারাজ নহে। এই সঙ্গে যদি তাহাদের বল-প্রকৃতিও কতকটা থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, কাজ করিবার শক্তি অপর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ স্থলে তাহাদের মানসিক ক্রিয়া কিঞ্চিৎ শ্লথগতি ও অনিশ্চিত হইয়া থাকে এবং চরিত্রে একটু কঠোরতা পরুষতা আসিয়া পড়ে ও মার্জ্জিতভাবের অভাব হয়।

এই প্রকৃতির লোক সকল ব্যবসায়ের মধ্যেই দেখা যায়—তবে ডাক্তার ও পাদ্রির মধ্যে এই প্রকৃতির লোক অধিক। প্রাণ প্রকৃতির সহিত মন-প্রকৃতির কতকটা সম্মিলন হইলে ভাল ডাক্তার ও ধর্ম্মপ্রচারক হওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ডাক্তারের প্রফুল্ল হাসি-মুখ রোগীর পক্ষে অত্যন্ত উপাদেয় – তাই ডাক্তারের প্রাণ-প্রকৃতি থাকা নিতান্তই আবশ্যক। বরং একটু বিদ্যার অভাব হইলে তত ক্ষতি নাই কিন্তু গোম্‌লামুখো, খিট্‌খিটে

অস্থিচর্ম্মসার ডাক্তার চিকিৎসা কার্য্যের পক্ষে নিতান্তই অনুপ-যুক্ত।

প্রাণপ্রকৃতিসম্পন্ন ধর্ম্মপ্রচারকেরা অনর্গল-বক্তা, আন্তরিক আগ্রহসম্পন্ন, উৎসাহী ও আবেগবান হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের ততটা গভীরতা, পাণ্ডিত্য বা বিচারশক্তি থাকে না—তাহারা যখন বক্তৃতা করে তখন তাহারা বুদ্ধির দিক দিয়া না গিয়া হৃদয়ের দিক দিয়া লোকদিগকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে।

তৃতীয়তঃ মন-প্রকৃতি; যাহাকে ফ্রেনলজির ভাষায় ইংরাজিতে মেন্‌ট্যাল টেম্‌পারেমেণ্ট বলে। প্রাণ-প্রকৃতিতে যেমন মেদ-মাংসের প্রাধান্য, মন-প্রকৃতিতে তেমনি মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর প্রাধান্য। মন-প্রকৃতির লক্ষণ, অপেক্ষাকৃত পাত্‌লা সুকুমার গঠনের দেহ—ছোট ছোট হাড়—পাত্‌লা পাত্‌লা মাংসপেশী—পাত্‌লা পাত্‌লা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং মাথা অপেক্ষাকৃত বড় এবং মস্তিষ্ক সজাগ ও সচেষ্ট। যে সকল কাজে বাহুবল অপেক্ষা বুদ্ধিবল ও কৌশলের প্রয়োজন, সেই সকল কাজ মন-প্রকৃতির উপযোগী। ছোট ছোট হাত, সুকুমার স্পর্শ, তীক্ষ্ণদৃষ্টি—মনপ্রকৃতির এই সকল লক্ষণ যাহার আছে, সে হাল্‌কা ধরণের যন্ত্রশিল্পীর কাজ করিবার উপযুক্ত। যথা, স্বর্ণকার, জহরীর কাজ, ঘড়ি তৈয়ারি বা মেরামতের কাজ, দর্জির কাজ, তন্তুবায়ের কাজ ইত্যাদি।

যাহাদের মন-প্রকৃতি,তাহাদের মনের স্বাভাবিক টান্ সেই সকল কাজের দিকে, যাহাতে বুদ্ধি খাটানো আবশ্যক হয় কিম্বা যাহাতে সৌন্দর্য্যবৃত্তি চরিতার্থ হয়—যেমন, আইনের কাজ, চিকিৎসার কাজ, পত্রসম্পাদকের কাজ, পুস্তকপ্রণেতার কাজ, শিক্ষকের কাজ, চিত্রকরের কাজ, গায়কের কাজ ইত্যাদি। যাহাদের মন-প্রকৃতি প্রবল, তাহারা এই সকল কাজে সফলতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু

ইহার সঙ্গে যথেষ্ট প্রাণ-প্রকৃতি না থাকিলে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে না। কেন না, ইহার দরুণ আবশ্যকীয় মানসিক পরিশ্রম করিতে হইলে, দেহের পুষ্টি যথেষ্ট থাকা আবশ্যক; নচেৎ, অতটা মানসিক শ্রম সহ্য হয় না। মানসিক প্রকৃতির দোষ এই, এই প্রকৃতির লোকেরা বুদ্ধি জ্ঞানের চর্চ্চাতেই অবিরত নিযুক্ত থাকে—ব্যায়াম কি বিরাম-বিনোদনের প্রতি তাহাদের বড় লক্ষ্য থাকে না। অনেক সময়ে তাহারা যে যথোচিত সফলতা লাভ করিতে পারে না, দৈহিক দুর্ব্বলতাই তাহার কারণ।

মন-প্রকৃতির সহিত যদি বল-প্রকৃতির সংযোগ হয়, তাহা হইলে, কি বিজ্ঞান, কি সাহিত্য, কি কলাবিদ্যা সকল বিষয়েই চরম উৎকর্ষ লাভ করা যায়। এই প্রকার প্রকৃতির লোকেরা যে সকল রচনা প্রকাশ করেন তাহা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী ধরণের হয়। মন-প্রকৃতির সহিত যাহাদের প্রাণ-প্রকৃতি সম্মিলিত হয় তাহারাও এই সকল বিষয়ে বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করে, কিন্তু তাহাদের কাজ বল-সংযুক্ত মনপ্রকৃতির ন্যায় ততটা উৎকৃষ্ট হয় না—তাহারা আপাততঃ খুব চটক্ লাগাইতে পারে কিন্তু তাহাদের কাজ বহুকাল স্থায়ী হয় না। অনেক সদ্‌বক্তা, উৎকৃষ্ট লেখক, বিখ্যাত রাজমন্ত্রী, ধর্ম্মাচার্য্য, আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎসক এই প্রকৃতির লোক।

বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কোন্ প্রকৃতি প্রবল? প্রাণ-প্রকৃতি ও মন-প্রকৃতির লোকই অধিকাংশ আমাদের মধ্যে দেখা যায়। বল-প্রকৃতির লোক অতি বিরল। সেই জন্য স্থায়ী বৃহৎ কাজ আমাদের মধ্যে বড় দেখা যায় না। আমরা ভাল বক্তা হইতে পারি, ধর্ম্মপ্রচারক হইতে পারি, শিক্ষক হইতে পারি, বিচারক হইতে পারি, মন্ত্রী হইতে পারি, কিন্তু যাহাতে দৈহিক বল ও শ্রমসহিষ্ণুতার আবশ্যক সেই সকল কাজে উৎকর্ষ লাভ করা আমাদের পক্ষে

আপাততঃ অসম্ভব। যথা, সৈনিকের কাজ—নাবিকের কাজ ইত্যাদি। যাহাতে বাঙ্গালীর বল-প্রকৃতি পরিপুষ্ট হয় তদ্বিষয়ে সকলের যত্ন করা উচিত। যে সকল কাজের জন্য আমরা এক্ষণে অনুপযুক্ত, বল-প্রকৃতির উন্নতি হইলে, সেই সকল কাজের জন্য আমরা উপযুক্ত হইতে পারি। অনেক কাজের দ্বার যাহা এক্ষণে আমাদের নিকট রুদ্ধ, তখন তাহা আপনা হইতেই উদ্ঘাটিত হইবে। কলকারখানার কাজে আমরা যে বড় প্রবেশ করিতে চাহি না তাহার অর্থ এই, আমাদের দৈহিক প্রকৃতি এখনও সেই সকল কাজের উপযুক্ত হয় নাই। ঘোড়সওয়ারের কাজ—জাহাজচালকের কাজ—রেলগাড়ি চালকের কাজ—অর্থাৎ যে সকল কাজে শ্রমসহিষ্ণুতা বল ও সাহসের আবশ্যক সেই সকল কাজে বাঙ্গালী হিন্দুরা প্রায়ই অগ্রসর হয় না। বল-প্রকৃতি পরিপুষ্ট হইলে এই সকল কাজের দ্বার আমাদের নিকট উন্মুক্ত হইবে। তখন আপনা হইতেই এই সকল কাজে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মিবে—এই সকল কাজকে তখন আর অপমানের কাজ বলিয়া আমাদের মনে হইবে না। কেরাণী ও আইনব্যবসায়ীর সংখ্যায় দেশ ছাইয়া গেল। আর চলে না। এখন জীবিকার নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করা নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে।

প্রলয়।

বাল্যকালে একদিন পিতামহীর নিকট শুনিতে পাই, পৃথিবী এক সময়ে উল্‌টিয়া যাইবে। সে দিন ভাল নিদ্রা হইয়াছিল কি না স্মরণ নাই। মনের ভিতর প্রবল বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল এইটুকু স্মরণ আছে। পরদিন পাঠশালায় একটি প্রবীণতর বন্ধু

আশ্বাস দেন, পৃথিবী উল্টাইবে সন্দেহ নাই; তবে এখনও তাহার লক্ষ বৎসর দেরী আছে। এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া অবশ্য পৃথিবীর ভবিষ্যৎ উল্টান অপেক্ষা পণ্ডিত মহাশয়ের বর্ত্তমান উপস্থিতি অধিকতর উদ্বেগের কারণ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলাম।

সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকগণ প্রলয়-তত্ত্ব সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা ও গবেষণা করিয়াছেন। ফলে পিতামহী ঠাকুরাণীর উক্তির সহিত বন্ধুর আশ্বাসবাণী যোগ করিলে যে কয়টি কথা হয়, তাহার অধিক বিজ্ঞানশাস্ত্রও কিছু বলেন না। প্রলয় একদিন ঘটিবে সন্দেহ নাই; তবে এখনও দেরী আছে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মুখেও এই রকমই কথা শুনা যায়। প্রাচীন কালের বিচক্ষণ ব্যক্তিরা অতি দূরদর্শী অথচ সরল-প্রকৃতিক ছিলেন। তাঁহারা অকস্মাৎ এক একটা বড় গভীর সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতেন; অথচ আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় যুক্তিতর্কের জটিলতা ও কঠিনতার ভিতর প্রবেশ করিতেন না। আজকাল লোকের আধ্যাত্মিক দূরদর্শিতার অভাবে এইরূপ কুটিল পথে পরিভ্রমণই ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে মনুষ্যজাতির সৌভাগ্যক্রমে দুই একজন লোক এমন কদাচিৎ পাওয়া যায়—যাঁহাদের দূরদর্শিতা অধিক না থাক্, বুদ্ধিরূপী আধ্যাত্মিক অনুবীক্ষণের সূক্ষ্মদর্শনশক্তির তীক্ষ্নতা বশে তাঁহারা প্রাচীন উক্তির ভিতর নানাবিধ সূক্ষ্ম তথ্য আবিষ্কার করেন। যাই হউক, আমরা সাধারণ মানব, সে কথা ছাড়িয়া বিজ্ঞানের নিকটেই সদুত্তরের প্রত্যাশা রাখি।

বিজ্ঞান একরকম সদুত্তরও দিয়াছেন। অধ্যাপক ক্লিফোর্ড সকলের কথা সামঞ্জস্য করিয়া বলিয়াছেন, পৃথিবীর ধ্বংস হইবে ঠিক্, তবে গরমে হইবে কি ঠাণ্ডায় হইবে বলা যায় না। অধ্যাপক জেবন্স্ বিজ্ঞানের কথা বিশেষ ভাবে সমালোচনা করিয়া মতপ্রকাশ করিয়া-

ছেন, পৃথিবীর ধ্বংস হইবে সন্দেহ নাই, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে হইবারই সম্ভব। তবে এই পর মুহূর্ত্তেই যে হইবে না তাহাও বলা যায় না। এমন সদুত্তর আর কি হইতে পারে! উত্তর পাঠকের তৃপ্তিকর হউক আর না হউক, পাঁচজন পণ্ডিতে এ সম্বন্ধে যে পাঁচ কথা বলেন, তাহাই এ প্রবন্ধে উপস্থিত করিব।

আমরা পৃথিবীর অধিবাসী, সুতরাং অন্য লোকের কথা ছাড়িয়া ভূলোকের কথা আমাদের আগে বিবেচ্য। ভূমণ্ডলটা যদি কিছুদিনের মধ্যে ভাঙিয়া চুরিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে গ্লাডষ্টোন্ সাহেবের এই বয়সে বানপ্রস্থাবলম্বনের পরিবর্ত্তে আইরিস হোমরুল লইয়া এত হাঙ্গামা করা ভাল হয় নাই।

প্রথম কথা এই। আমাদের পৃথিবী সৌরজগৎরূপ একটি পরিবারের অন্তর্গত। সূর্য্যমণ্ডলকে মধ্যে রাখিয়া যে কয়টি ছোট বড় গ্রহ বহুকাল হইতে অকারণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পৃথিবী তন্মধ্যে অন্যতম। সূর্য্যমণ্ডলের প্রবল আকর্ষণে ইহারা সূর্য্যমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে; কিন্তু ইহাদের পরস্পর আকর্ষণে কেহই একটা নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরিতে পায় না। পৃথিবীও সেইজন্য একটা নির্দ্দিষ্ট বাঁধা পথে ঘুরিতে পায় না; সর্ব্বদাই সূর্য্যাকর্ষণনির্দ্দিষ্ট কক্ষ হইতে একটু না একটু ভ্রষ্ট হইয়া চলিয়া থাকে। এখন প্রশ্ন এই, এই কক্ষভ্রংশ বা কক্ষচ্যুতি বশতঃ এমন সময় কি আসিতে পারে না যখন দুইটা গ্রহ অকস্মাৎ এক সময়ে এক জায়গায় উপস্থিত হইয়া পরস্পর প্রতিঘাতে চূর্ণিত হইয়া যাইতে পারে?

উত্তর দেওয়া বড় সহজ নহে। নিউটন দুইটা পদার্থের মধ্যে আকর্ষণের নিয়ম বাহির করিয়া ভবিষ্যৎ পণ্ডিতবর্গের মস্তকে একটা প্রকাণ্ড বোঝা দিয়া অব্যাহতি পান। জগতের মধ্যে দুইটা মাত্র পদার্থ থাকিলে কোন্‌টা কখন্ কোথায় যাইবে স্থির করিতে

কষ্ট পাইতে হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় জগতের খণ্ডপদার্থের সংখ্যা দুইয়ের অনেক বেশী। তিনটা পদার্থ পরস্পরকে নিউটনের নিয়মে আকর্ষণ করিতে থাকিলে কখন্ কোনটা কোন্খানে থাকিবে স্থির করিতে গণিতজ্ঞদের জীবনীশক্তি ওষ্ঠপ্রান্তে আইসে। চারিটা পদার্থ লইয়া স্থির করিতে গেলে সমস্যা বিভ্রাট্ দাঁড়ায়। সমস্যা দুরূহ সন্দেহ নাই; তথাপি লাপ্লাস্ এই সমস্যা পূরণে কতকদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। লাপলাস্ প্রতিপন্ন করেন, পরস্পরের আকর্ষণে গ্রহগণের চিরস্থায়ী কক্ষচ্যুতির কোনরূপ আশঙ্কা বা সম্ভাবনা নাই। সূত্রলম্বিত পেণ্ডুলম্ বা পরিদোলক—যেমন ঘাত প্রতিঘাতে স্বস্থান হইতে একেবারে ভ্রষ্ট হয় না, কেবল সেই স্থানকে লক্ষ্য করিয়া একটু এদিক্ ওদিক্ দুলিতে থাকে বা নড়িতে থাকে; সেইরূপ প্রত্যেক গ্রহ সহচরীদের আকর্ষণ ফলে আপন পথ হইতে একটু ইতস্ততঃ চলে মাত্র; ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথের দিকেই প্রত্যাবৃত্ত হয়। এমন বল কিছুই বর্ত্তমান নাই, যাহাতে চিরকালের মত তাহার কক্ষচ্যুতি সম্পাদন করিতে পারে। সুতরাং সৌরজগতের মধ্যে গ্রহে গ্রহে ঠোকাঠুকি হইয়া মহাপ্রলয়ের কোন সম্ভাবনা নাই।

মহামনস্বী লাপ্লাস্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন। পরবর্ত্তী গণিতজ্ঞেরা লাপলাসের যুক্তির অভ্যন্তরে কোন ত্রুটী ধরিতে পারেন নাই। এমন কি কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কালেজের অধ্যক্ষ বিখ্যাত হুইবেল সাহেব লাপলাসের এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়াছিলেন, দেখ বিধাতার কি অপূর্ব্ব কৌশল; সৌর জগতের মত এমন জটিল যন্ত্রের মধ্যে এমন সুনিয়ত শৃঙ্খলা, যে, সেই যন্ত্র কখন বিকল হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। মা ভৈঃ, মানব, মা ভৈঃ। জগতের বিলোপ নাই।

লাপলাসের গণনায় প্রমাদ নাই সত্য, কিন্তু আর একটা উপদ্রবের সম্ভাবনা আছে। সুন্দর সুনিয়ত সৌরজগতের মধ্যে কোথা হইতে মাঝে মাঝে ভীমপুচ্ছধারী অজ্ঞাতকুলশীল ধূমকেতু নামে পদার্থ এক একটা চলিয়া আইসে, তাহাদের দেখিলে অদ্যাপি পণ্ডিতগণেরও মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। ধূমকেতুর উদয়ে মহামারী বা রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কায় কাঁসর ঘণ্টা বাজান লোকে আর আবশ্যক বোধ না করিতে পারে; কিন্তু ইহাদের স্থিতি গতি আকার অবয়ব এমনি রহস্যপূর্ণ, যে, একটু আতঙ্ক না হইয়া যায় না। মাধ্যাকর্ষণ অন্যান্য পদার্থের ন্যায় ধূমকেতুকেও অধীনে রাখিয়াছে বটে; কিন্তু ইহারা কোথায় থাকে, কোথা হইতে আইসে, কিছুই যখন জানা নাই, তখন কোন অজ্ঞাত অনির্দ্দেশ্য স্থান হইতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া মাধ্যাকর্ষণের বলেই আমাদের নিকটে আসিয়া পৃথিবীকে একটা আকস্মিক ধাক্কা দিয়া ফেলিলে পণ্ডিতেরা তর্ক করিবার অবসর না পাইতেও পারেন। আজকাল এ আশঙ্কা কতকটা নিরাকৃত হইয়াছে বলিতে হইবে। ধূমকেতুর আকার আয়তন যতই ভয়াবহ হউক, উহারা বড়ই লঘুপ্রকৃতিক; অর্থাৎ কি না আয়তনে যে দশটা পৃথিবীর সমান, ওজনে হয়ত সে দশ ছটাকও হয় না। সুতরাং দশটা পৃথিবী কেন, দশ হাজারটা সূর্য্যের সমান আয়তন হইলেও ধূমকেতুর ধাক্কা তত ভয়ানক না হইতেও পারে। আবার এরূপও শুনা যায় যে, ইতিমধ্যে আমরা অজ্ঞাতসারে দু একটা ধূমকেতুর পুচ্ছের অভ্যন্তর দিয়া চলিয়া গিয়াছি, তাহা বুঝিতেও পারি নাই। ১৮৭২ সালের নবেম্বর মাসে একবার একটা ধূমকেতুর পুচ্ছের ভিতর দিয়া পৃথিবীকে যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় উল্কাবৃষ্টি ভিন্ন অন্য কোন উৎপাত লক্ষিত হয় নাই। এই দেখিয়া ও আরও অন্যান্য কারণে আজকাল

অনেকেই সন্দেহ করেন, ধূমকেতু কেবল উল্কাপিণ্ডের পাল মাত্র। বোধ হয় প্রকৃতই তাই। তাহা হইলে ধূমকেতুর সংঘর্ষে ভূমণ্ডলের বড় বিপদের আশঙ্কা নাই। একবার একটা ধূমকেতু বৃহস্পতি গ্রহের সন্নিহিত হইয়াছিল। বৃহস্পতির তাহাতে কিছুই হয় নাই। ধূমকেতুরই গন্তব্যপথ বিচলিত হইয়াছিল মাত্র।

ধূমকেতু সংঘর্ষের আশঙ্কা না থাকিলেও সৌরজগতের বাহির হইতে অন্য কেহ আসিয়া যে পৃথিবীর উপর নিপতিত না হইতে পারে ইহার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। লাপ্লাসের গণনা সৌরজগতের অভ্যন্তরেই খাটে, বাহিরের কোন পদার্থের উপর খাটে না। বাহির হইতে কোন পদার্থ কোন কালে আসিয়া আকস্মিক প্রলয় উৎপাদন করিতে পারে না, সাহস করিয়া বলা যায় না। নক্ষত্রলোকে বরং এইরূপ আকস্মিক প্রলয়ব্যাপারের দুই একটা উদাহরণ দেখা যায়। কিছু দিন হইল হগিন্স সাহেব একটা নক্ষত্রকে হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলেন। কিছু দিন জ্বলিয়া আবার নিভিয়া যায়। হগিন্স যন্ত্র সহকারে তাহার আলোক বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন, হঠাৎ হাইড্রোজেন অর্থাৎ উদজান বাষ্প জ্বলিয়া উঠায় ঐরূপ ঘটিয়াছে। হাইড্রোজেন জ্বলিয়া উঠা বড় সহজ কথা নহে। হাইড্রোজেন পোড়াইলে অবশ্য জল হয়। কিন্তু একটা বোতলে হাইড্রোজেন পুরিয়া তাহা পোড়াইতে থাকিলে এত উত্তাপ জন্মে যে, তাহার ক্ষুদ্র শিখাতে লোহার পাত কাগজের মত পুড়িতে থাকে, প্লাটিনম্ পর্য্যন্ত গলিয়া যাইতে পারে। সুদূর একটা নক্ষত্রে হাইড্রোজেন জ্বলিয়া উঠা সামান্য কাণ্ড নহে। পৃথিবীর ইতিহাসেও বোধ করি এই ব্যাপার এক সময়ে ঘটিয়াছিল। আজকাল বায়ুর মধ্যে উদজান বর্ত্তমান নাই, কিন্তু এককালে যথেষ্ট বর্ত্তমান ছিল। অবশ্য এক সময়ে সেই সমুদয় উদজান

পুড়িয়া যায়; সেই দিন হইতে সমুদ্রের উৎপত্তি। আর এক্ষণে উদজানের অবশিষ্ট পুড়িতে নাই; সে আশঙ্কাও নাই। উদজান ভিন্ন অন্য পদার্থও এত পরিমাণে বর্ত্তমান নাই, যাহা হঠাৎ জলিয়া উঠিয়া একটা প্রলয় ব্যাপার ঘটাইতে পারে। দহনাদি রাসায়ণিক ক্রিয়া ভূমণ্ডলে এখনও না চলিতেছে এমন নহে, তবে তাহা এত ধীরে সুস্থে সম্পন্ন হইতেছে যে, তাহাতে বিশেষ আশঙ্কা নাই, তবে ভূমিকম্পরূপে বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমরূপে প্রাদেশিক উৎপাত সময়ে সময়ে ঘটায় বটে। হগিন্স যে নক্ষত্র জলিয়া উঠা দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ ঘটনা আরও কয়েকবার দেখা গিয়াছে। এই গতবৎসরই উত্তরাকাশে অরিগা নামক নক্ষত্রপুঞ্জের সমীপে একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব নক্ষত্র কিছু দিন ধরিয়া দীপ্তি সহকারে জলিয়া নিবিয়া গিয়াছে। এই আকস্মিক দীপ্তির কারণ নির্ণীত হইয়াছে ঠিক্ বলা যায় না। সর্ব্বত্রই যে আভ্যন্তরীণ কারণে নক্ষত্র জলিয়া উঠে এমন না হইতে পারে। বাহ্য বস্তুর আঘাত অর্থাৎ নক্ষত্রে নক্ষত্রে সংঘর্ষ ঘটিয়া অগ্ন্যুদ্গম অসম্ভব নহে।

বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের মধ্যে ব্যবধান এত অধিক যে, এই দুই-এর কক্ষপথের মধ্যে অন্য কোন গ্রহ থাকিতে পারে অনেক দিন ধরিয়া জ্যোতিষীরা সন্দেহ করিতেন। অলবার্স সাহেবের অনুসন্ধান ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরেই সেই প্রদেশে, অর্থাৎ বৃহস্পতির ও শনৈশ্চরের কক্ষপথের অভ্যন্তরে নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত হয়। একটা বড় গ্রহের পরিবর্ত্তে পরস্পর সন্নিকৃষ্ট কতকগুলি ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কৃত হয়। একটি একটি করিয়া আজি পর্য্যন্ত প্রায় তিনশত ক্ষুদ্র গ্রহ ঐ প্রদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, পূর্ব্বে ঐখানে বৃহস্পতি গ্রহাদির সমকক্ষ একটা বৃহদায়তন গ্রহ বর্ত্তমান ছিল। কোন কারণে সেই বৃহৎ গ্রহটি

ভাঙ্গিয়া গিয়া শতখণ্ডে বিভক্ত এতগুলি ক্ষুদ্র গ্রহে পরিণত হইয়াছে। স্বয়ং অলবার্স সাহেবের এই বিশ্বাস ছিল; এবং এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়াই তিনি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন। যদি তাহাই ঠিক্ হয়, তবে আমাদের নিকটেই প্রলয়ব্যাপারের সূচনা পাওয়া যাইতেছে। *

দেখা যাইতেছে কোন বাহ্য অনির্দ্দেশ্য অচিন্তিতপূর্ব্ব কারণে অলক্ষিতপূর্ব্ব গ্রহাদির সংঘর্ষে পৃথিবী যে হঠাৎ চূর্ণ হইতে পারে না, তাহা কোন জ্যোতিষী সাহস করিয়া বলিতে পারেন না।

আর একটা কথা আছে। পৃথিবী আপন অন্তরস্থ শক্তির বলে হঠাৎ ফাটিয়া শত খণ্ড হইতে পারে কি না। ভূমণ্ডলের অন্তর্ভাগ এখনও বিষম তপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। এত তপ্ত যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর গলিত, দ্রব অবস্থাপন্ন বলিয়াই এতকাল সকলের সংস্কার ছিল। লর্ড কেলবিন দেখাইয়াছেন, ভূগর্ভ যতই তপ্ত হউক না কেন, উপরের ভূপৃষ্ঠের চাপ এত অধিক যে, অভ্যন্তর ভাগ দ্রব অবস্থায় নাই। দ্রব অবস্থায় যে নাই, তাহার অন্য প্রমাণও পাওয়া যায়। সমুদ্রে যেমন চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণ-গুণে জোয়ার ভাঁটার আন্দোলন অনবরত হইতেছে, পৃথিবীর অভ্যন্তর দ্রব হইলে সেখানেও সেইরূপ আন্দোলন সর্ব্বদা চলিত। ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীর পক্ষে সে ব্যাপারটা বড় সন্তোষজনক হইত না। সেরূপ আন্দোলন নাই দেখিয়া কেলবিন অনুমান করেন ভূগর্ভ অন্ততঃ ইস্পাতের মত কঠিন।

পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগটা অবশ্য গর্ভভাগের সহিত তুলনায় অত্যন্ত শীতল হইয়াছে। এককালে গরম ছিল সন্দেহ নাই, এককালে

* অনেকে ক্ষুদ্র গ্রহগুলির উৎপত্তির অন্য কারণ নির্দ্দেশ করেন। বড় গ্রহ ভাঙ্গিয়া শতখণ্ড হইয়াছে ঠিক্ নহে; বৃহৎকায় বৃহস্পতির ও শনৈশ্চরের প্রবল আকর্ষণ প্রভাবে ক্ষুদ্র গ্রহগুলি জমাট বাঁধিয়া একটা বড় গ্রহে পরিণত হইতে পায় নাই।

তরল অবস্থায় ছিল তাহাও বিশ্বাস করিতে হয়। কতদিন তারল্য ঘুচিয়া কাঠিন্যে দাঁড়াইয়াছে, তাহাও একরকম মোটামুটি গণনা করা চলে। ভূপৃষ্ঠ ক্রমে ক্রমে শীতল ও কঠিন হইয়াছে, এবং সেই ক্রমশঃ সঙ্কোচনের জন্য বন্ধুর, উঁচুনীচু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সরস ফল রৌদ্রে শুকাইলে যেমন তাহার ত্বক্ বন্ধুর জড়সড় হয়, ভিজা মাটি যেমন শুকাইলে কোঁকড়া হয় বা ফাটিয়া যায়, কতকটা সেই-রূপ। ভূপৃষ্ঠে অমনি স্থানে স্থানে ফাট আছে। গর্ভস্থ তপ্ত পদার্থ কখন কখন সেই ফাট দিয়া প্রবল বেগে বাহির হইয়া পড়ে। তখন একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড ঘটে; ইহারই নাম অগ্নিগিরির অগ্ন্যুৎপাত। সেদিন ৮২ সনের ক্রাকাটোয়ার অগ্ন্যুৎপাতে যে সকল পদার্থ ভূগর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়া নভোমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা আজিও কতক কতক বায়ুরাশিতে ভাসিতেছে। সমুদয় অধঃপতিত হয় নাই। অবশ্য পুরাকালে পৃথিবী যখন আরও উত্তপ্ত ছিল, তখন-কার অগ্ন্যুৎপাতে যে আরও প্রবল ঘটনা ঘটিত সন্দেহ নাই। হিসাবে দেখা যায়, কোন পদার্থ সেকণ্ডে আট মাইল বেগে উৎক্ষিপ্ত হইলে তাহা আর ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসে না। হয়ত পুরাকালে কোন প্রবল অগ্ন্যুৎপাতে পৃথিবীর দুই এক টুকরা চিরকালের মত পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। রবার্ট বল সাহেবের মতে এই-রূপে অনেক উল্কাপিণ্ডের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। যাহাই হউক, পৃথিবীর অন্তরস্থ শক্তি এখন যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহাতে ক্রাকা-টোয়ার ব্যাপারের মত একটা ছোটখাটো প্রাদেশিক প্রলয় ঘটা-ইতে পারে, কিন্তু তাহার দ্বারা ভবিষ্যতে একটা মহাপ্রলয়ের আশঙ্কা আছে বোধ হয় না। একটা প্রকাণ্ড অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়া পৃথিবী যে দ্বিধা বা সহস্রধা ভগ্ন হইয়া যাইবে সেরূপ আশঙ্কা বড় নাই।

লাপলাস গ্রহগণের কক্ষচ্যুতির একটা প্রবল কারণ গণনার

মধ্যে ধরেন নাই। লর্ড কেলবিন স্বয়ং ও তৎপথানুবর্ত্তী জর্জ ডারুইন্ এ সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন। চন্দ্রমণ্ডল সমুদ্রের জলরাশিকে প্রত্যহ পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনের প্রতিকূলে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ফলে পৃথিবীর আবর্ত্তনের বেগ ক্রমে একটু করিয়া কমিতেছে ও চন্দ্রের দূরত্বও একটু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। এমন দিন ছিল যখন চন্দ্রমণ্ডল আমাদের আরও নিকটে ছিল। এমন সময় আসিবে যখন চন্দ্র আরও দূরে যাইবে। এখন ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী একবার আবর্ত্তিত হয়; তখন এগার শ কি বার শ ঘণ্টায় পৃথিবী আবর্ত্তন করিবে। এখন ছোট দিনের প্রায় তিনশ পঁয়ষট্টি দিনে বৎসর হয়; তখন সেই বড় বড় দিনে সাত দিন কি আট দিনে বৎসর হইবে। মনুষ্য জাতিকে সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে কি না জানি না; কিন্তু ঘটনাটা অনিবার্য্য।

যে কারণে চন্দ্র পৃথিবী হইতে দূরে যাইতেছে, ঠিক্ সেই কারণে পৃথিবীও সূর্য্য হইতে ক্রমশঃ দূরে যাইবে। পৃথিবীর কক্ষচ্যুতির এই একটা কারণ। ইহার ফল নির্দ্দেশ বাহুল্য।

আর একটা কথা। আকাশ যে সর্ব্বতোভাবে শূন্য নহে তাহা প্রতিপন্ন নহে। আলোকবাহী ও তাড়িত-তরঙ্গবাহী ঈথর নামক পদার্থ সমগ্র আকাশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। পৃথিবী সেই ঈথর ঠেলিয়া স্বীয় মার্গে ভ্রমণ করিতেছে। জল কিংবা বায়ু পদার্থের গমনে বাধা দেয়, ঈথর অতি সূক্ষ্ম ও লঘু পদার্থ হইলেও যে কিছুমাত্র বাধা দেয় না তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে এ বিষয়ে এখনও সম্যক্ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ঈথরের গতিঘাত ক্ষমতা আছে কি না টেট্ সাহেব অনেক চেষ্টায় তাহার প্রমাণ পান নাই। ঈথরের প্রতিঘাতে এন্‌কি সাহেবের আবিষ্কৃত ধূমকেতুর কক্ষচ্যুতি অনেকে

অনুমান করিতেন। টেট্ সাহেব দেখাইয়াছেন অন্য কারণে সেই কক্ষচ্যুতি সম্ভব।

সম্প্রতি অনেকে সাধারণ জড়পদার্থের সহিত ঈথরের সম্বন্ধ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত আছেন। তাঁহাদের অনুসন্ধানে কি দাঁড়াইবে বলা যায় না। যে কারণেই হউক, পৃথিবীর বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতেছে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে অহোরাত্র যত বড় দিন, এখন তার চেয়ে একটু, সাতাইশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র, বাড়িয়াছে। মাত্রা যাহাই হউক, কালে বেগ আরও মন্দ হইবে সংশয় নাই।

লর্ড কেলবিনের নাম দুই একবার উল্লেখ করিয়াছি। কেল-বিন্ একটা প্রকাণ্ড তথ্যের আবিষ্কর্ত্তা। বাঙ্গলায় ইহাকে জাগ-তিক শক্তির অপচয় বলা যাইতে পারে। সম্প্রতি শক্তি জগতে নানা রূপে বিদ্যমান। কিন্তু শক্তি অপচয়োন্মুখী। শক্তিমাত্র আপনা হইতে সহজে তাপরূপে পরিণত হয়। কিন্তু তাপ সহজে রূপান্তরিত হইয়া শক্ত্যন্তরে পরিণত হয় না। ফলে এমন দিন আসিবে, যখন শক্তির আর প্রকারভেদ থাকিবে না। জগদ্‌যন্ত্রের চলাচল বন্ধ হইবে। গ্রহ উপগ্রহ গতিরহিত হইয়া সূর্য্যে মিলিবে। সূর্য্যে সূর্য্যে নক্ষত্রে নক্ষত্রে মিলিয়া যাইবে। ব্রহ্মাণ্ড একটা গতিহীন, বৈচিত্র্যহীন, তপ্ত অথবা শীতল মহাপিণ্ডের আকার ধারণ করিবে। এই পরিণাম নিবারণ করিতে পারে, এমন উপায় কিছু আছে দেখা যায় না। যদি তত দিন ধরিয়া বর্ত্তমান নিয়মাধীনে জগৎ চলে, তবে এই পরিণাম অনিবার্য্য। এই পরিণামকে মহাপ্রলয় বলিতে পার। হর্বার্ট স্পেন্সর মনে করেন এই প্রলয়ান্তে পুনরায় নূতন সৃষ্টির আরম্ভ হইবে। কিরূপে হইবে, তাহার সঙ্গত উত্তর কিছু দেন না।

হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌ একটা প্রকাণ্ড কথা বলিয়াছেন। সূর্য্যমণ্ডল আমাদের জীবনদাতা। সূর্য্যমণ্ডল প্রভূত পরিমাণে তাপরশ্মি বিকীরণ করিতেছে। তাহার কণিকামাত্র লইয়া আমাদের উৎপত্তি, স্থিতি, ও গতিবিধি। সূর্য্যমণ্ডলে তাপ জন্মিতেছে আর বাহির হইয়া যাইতেছে; সূর্য্যমণ্ডল ততই আয়তনে সঙ্কীর্ণ হইতেছে। সূর্য্যের পরিধি বৎসর বৎসর প্রায় আশী হাত খাটো হইতেছে। দু দশ হাজার বৎসরে আমরা অবশ্য তাহা টের পাই না; কিন্তু অর্দ্ধ কোটি বৎসরের মধ্যে সূর্য্যের আয়তন বর্ত্তমানের আট ভাগ অর্থাৎ দুই আনা মাত্র দাঁড়াইবে। এমন দিন আসিবে যখন ভাস্কর প্রভাহীন হইবেন। গগনপ্রদেশ অনুসন্ধান করিয়া এমন নির্ব্বাপিত সূর্য্যমণ্ডল দুই একটার খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। আমাদের সূর্য্যেরও সেই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। তাহার বহুপূর্ব্বে পৃথিবী জীবশূন্য হইবে বলা বাহুল্যমাত্র।

প্রলয় সম্বন্ধে বিজ্ঞানের এইরূপ উক্তি। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার হুইবেল তদানীন্তন বিজ্ঞানের মুখপাত্রস্বরূপ হইয়া বলিয়াছিলেন, ভয় নাই। পঞ্চাশ বৎসর পরে পণ্ডিতমণ্ডলী একরকম একবাক্যে বলিতেছেন, ভরসাও নাই।

কৃতজ্ঞতা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ধীরে ধীরে অকালী সিং দেউড়ীতে ফিরিয়া চলিল। যে ক্রোধাবেগে অধীর হইয়া মত্ত করীর মত সে সিদ্ধেশ্বর রায়কে অবহেলায় ছুড়িয়া ফেলিয়াছিল তাহা যেমন তীব্র তেমনি ক্ষণিক। আকস্মিক

উন্মাদ অধিকৃত হইয়া মানুষ যখন জীবনের সমস্ত দায়িত্ব বিস্মৃত হয়, তখন তাহার সেই অবস্থা। কিন্তু অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিতে না করিতে চৈতন্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা অবসাদ আসিয়া ক্রমে তাহাকে আচ্ছন্ন করিল। নিজের জন্য অকালী সিং কখন ভাবিত না, তখনও ভাবিতেছিল না, কিন্তু রাগ পড়িয়া গেলেই তাহার মনে হইতে লাগিল যে, হয়ত ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করিয়া ফেলিয়া সে প্রভুকন্যার সর্ব্বনাশ করিল। অকালী সিং বুঝিল যে, যে জোরে সে সিদ্ধেশ্বরকে ফেলিয়া দিয়াছিল তাহাতে তাহার প্রাণ-বিয়োগ না হইলেও গুরুতর আহত হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই উপলক্ষে মামলা মোকদ্দমা বাধিয়া উঠা অনিবার্য্য। সর্ব্বস্বান্ত ছোট তরফের এমন বল নাই যে, সেরূপ একটা সঙ্গীন্ বিপদ সাম-লাইয়া উঠে। অকালী সিং এক একবার মনকে প্রবোধ দিল বটে যে, না হয় খুন কি জখমের দায়ে সে নিজে আপদে পড়িবে, তার সুরোদিদির কোন অলক্ষণ না হইলেই হইল। কিন্তু তখনি আবার মনে হইতেছিল, তাহার অবর্ত্তমানে কে সে সরলা বালিকার হিতাকাঙ্ক্ষা করিবে। অন্তিমশয্যায় প্রভুর কাছে অকালী সিং যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, তাহার প্রাণ থাকিতে সুরোদিদিকে সে কখন ছাড়িয়া যাইবে না, হায় তাহা বুঝি আর রক্ষা হয় না।

মনের এই অবস্থায় অকালীসিং ক্রমে প্রভুগৃহের সমীপবর্ত্তী হইল। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল কেহ তাহার অনুসরণ করি-তেছে। রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর, কৃষ্ণ দ্বাদশীর সূচীভেদ্য অন্ধকারে পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষরাজি কচিৎ বায়ুহিল্লোলে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগের মত স্বনিয়া স্বনিয়া উঠিতেছে, কচিৎ কালপেচক বিকট কণ্ঠে দিকে দিকে ধ্বনি জাগ্রত করিতেছে, কোথাও সশঙ্ক কুক্কুর সহসা চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। এই স্থান এবং কালে স্পষ্টতঃ অকালীসিং মানুষের

পদশব্দ শুনিতে পাইল। কিন্তু পশ্চাতে ফিরিয়া আসিয়া কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিল না। অকালী সিংএর দেউড়ী প্রবেশের কিছু পরে কেহ আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল।

অকালী সিং আহার না করিয়াই বাহিরে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া অবসন্ন মনে একেবারে খাটিয়া আশ্রয় করিল। শয়নের জন্য নহে, চিন্তার জন্য। একবার ভাবিল, ভগীদাসীকে উঠাইয়া সকল কথা বলিয়া একটা পরামর্শ করিবে। কিন্তু একে স্ত্রীজাতির বুদ্ধিশুদ্ধির উপর তাহার কোন কালে তেমন বিশ্বাস ছিল না, তাহাতে ভগী আর কিছু করিতে না পারুক কাঁদিয়া কাটিয়া স্বরবালার ঘুম ভাঙ্গাইয়া পাছে একটা কাণ্ড করিয়া বসে, ইহা ভাবিয়া অকালী সিং সে কথাটা মনে স্থান দিল না। এমন সময়ে কেহ দ্বারে করাঘাতের উপর করাঘাত করিল।

রুক্ষস্বরে অকালী সিং হাঁকিল "কোন হায়?" আগন্তুক ঠিক্ সেই স্বরে বরঞ্চ সুর একটু চড়াইয়া দিয়া সেই কথাটাই পুনরুক্ত করিল। বলিল "দুয়োরটা একবার খুলেই দেখ না বাপু! একে কোম্পানির কাজে রাত বিরেত নেই, তার ওপর যদি লোকের দুয়োরে চারদণ্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে "কোন হায়" আর "হাম হায়" করে রাত কাটাতে হয়, তবে আর জান্ বাঁচেনা। খোল বল্‌চি দরওয়ান।"

অকালী সিং বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিল "ফাজিল কথা রেখে দাও। কে তুমি?"

লোকটা পথশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছিল, কোম্পানির নাম লওয়া সত্ত্বেও বরকন্দাজটা দুয়ার খুলিয়া না দেওয়ায় সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিল "আমি কালেক্টর সাহেবের চাপরাসী খোদা খাঁ। সাহেবের হুকুম মতে ছোট তরফে খবর দিতে এসেছি যে, কাল বেলা নটার সময় হুজুর এখানে পৌছবেন।"

কাজেই অকালী সিং দরজা খুলিয়া দিল। তারপর চাপরাসীকে বসাইয়া এবং তাহাকে তামাক চকমকী কলিকা দিয়া তাহার আহারাদির ব্যবস্থার জন্ম ভগীদাসীকে উঠাইতে গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অকালী সিং যথাসম্ভব অনুচ্চস্বরে ভগীকে ডাকিলেও ভগীর সঙ্গে সঙ্গে সুরবালারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। এবং ভগী প্রদীপ হস্তে নীচে আসিলে সেও সুতরাং নামিয়া আসিল। উভয়ে একটু একটু উদ্বিগ্ন হইয়াই আসিয়াছিল—কেন না এত রাত্রে জমাদার কখন তাহাদিগকে ডাকিয়া উঠায় না। দুর্ভাবনায় অকালী সিংএর সৌম্য-মূর্ত্তি দণ্ড দুই তিনের ভিতরেই কেমন শুষ্ক বিশুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উজ্জল চক্ষু দুটি হইতে একটা শূন্য বিষাদের ভাব প্রতিভাত হইতেছিল। প্রদীপের আলোক অকালীর মুখে চোখে পড়িবামাত্র ভগী ও সুরবালা যুগপৎ চমকিয়া উঠিল।

"কি হয়েচে জমাদার, কি হয়েচে জমাদার" বলিয়া সুরো আদরে অকালী সিংহের কাঁধ দুটিতে তাহার কচি কচি হাত দুখানি রাখিল। তাহাতে একটা অনির্ব্বচনীয় অপত্যস্নেহস্পর্শতুল্য বিমল সুখ অনুভব করিয়া অকালী সিং আপনার উদ্বেলিত হৃদয়ভাব গোপন করিতে গিয়া দুই ফোঁটা চোকের জল না ফেলিয়া থাকিতে পারিল না। আপনার বস্ত্রাঞ্চলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া সুরবালা কাতরকণ্ঠে বলিল "জমাদার, তুমিও বুঝি আমার মতন স্বপন দেখেছ? তা স্বপনে আপনার মন্দ দেখ্‌লে পরের মন্দ হয়—নয় ভগী বেটী? আমিও একটা ভারি ভয়ের স্বপন এই মাত্তর দেখ্‌ছিলাম জমাদার। কে যেন তোমায় আমাদের দেউড়ী থেকে চুরী করতে এয়েচে।

তুমি বল্‌লে দিদি হুকুম দাও, ওর মাথা কেটে আনি।" এমন সময়ে তুমি ডাক্‌লে আর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

অকালী সিং দেখিল এই স্বপ্ন নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে। দেবী বুঝি এই স্বপ্নচ্ছলে সরলা বালিকার কোমল হৃদয় আগে হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছেন। স্থির কণ্ঠে অকালী বলিল "দিদি, আমিও স্বপ্নে দেখেছি, তোমার দেউড়ী থেকে আমায় ধরে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমি আবার ফিরে আসব!"

ভগী বলিল,—"জমাদার, আজ দেড় কুড়ি বছর এই মনিব-বাড়ীতে এক সঙ্গে আছি, তোমার চেহারা কখন এত খারাপ দেখিনি! সত্যিই কি তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে? এই বৃহৎ পুরীতে একা সুরোকে নিয়ে কি করে কাটবে?" ভগী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

অকালী সিং দেখিল, যাহা সে আশঙ্কা করিয়াছিল তাহা হইতে বসিয়াছে! অতএব মুখ বিকৃত করিয়া ভগীকে ভ্যাঙ্গাইয়া সে সুরোদিদিকে হাসাইয়া দিল এবং বলিল যে, সুরোদিদি ও সে দুই ভাই বোনে ছেলেমানুষ, স্বপন দেখে তারা কাঁদচে বলে "বুড়ি" ভগীর কাঁদবার কি এক্তিয়ার। কাজেই ভগী বিপদের কোন কথা তখন বুঝিতে পারিল না। সুরবালাও নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা গেল।

কালেক্টর সাহেবের চাপরাসী অতঃপর পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিয়া শয়ন করিল। অকালী সিং সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও চক্ষু বুজিতে পারে নাই। সেদিনকার ঘটনাপরম্পরা আলোচনা করিয়া সে স্থির বুঝিয়াছিল, রজনী প্রভাতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রভু-কন্যার অদৃষ্ট পরীক্ষিত হইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অকালী সিং মোকদ্দমা মামলার কিছু কিছু বুঝিত। ইংরেজ রাজত্বে বিচার যে ধনসম্পত্তিগত এবং সকলতাতেই "সাবুদের" জয়, ইহা সে বড় এবং ছোট তরফের বিস্তর মোকদ্দমায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিল। অতএব তাহার অবর্ত্তমানে সুরোদিদির কি দশা হইবে ভাবিতে গিয়া এক একবার যখন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, আশা তখন দুষ্ট সরস্বতীর মত তাহার কানে কানে বলিতেছিল "ভয় কি, তুমি যে নেমকহারামটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছ, তার সাক্ষী কে?" ইহাতে প্রথম প্রথম একটু আশ্বস্ত হইলেও অকালী সিংএর ধর্ম্মবুদ্ধিতে আঘাত লাগিতেছিল। আত্মরক্ষার জন্য আদৌ তাহার ভাবনা হয় নাই। কিন্তু প্রভুর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে সেই যে আজীবনের প্রতিশ্রুতি, তার সঙ্গে বীরধর্ম্মের কর্ত্তব্যজ্ঞানকে অনেক ক্ষণ যুঝিতে হইয়াছিল। "প্রাণ থাকিতে সুরোকে কি করিয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় ফেলিয়া যাইব? প্রভু প্রমথনাথ স্বর্গে বসিয়া কি আমার নেমকহারামি দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিবেন না!" এই চিন্তা অকালী সিংকে আকুল করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু এদিকে প্রমাণ নাই বলিয়াই কি সে কাপুরুষের মত মিথ্যাছলনায় জীবনভার বহন করিবে? যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, অকালী সিং সিদ্ধেশ্বর রায়ের এ দশা কে করিল জান, তখন কি অকালী যে-সে মানুষের মত আপনার কৃতকার্য্য অস্বীকার করিয়া বসিবে? ছিছ! অকালী সিং হইতে তাহা হইবে না। অতএব কৃতজ্ঞতার এবং বীরধর্ম্মে প্রায় সমস্ত রাত্রি যে দ্বন্দ্ব বাধিয়াছিল, প্রভাত হইতে না হইতে তাহার একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া জমাদার অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল হৃদয়ে শয্যা ত্যাগ করিল।

কালেক্টর সাহেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ম অকালী সিং যথাসাধ্য উদ্যোগ আয়োজন করিল। প্রমথনাথ বিস্তর ব্যয়ে এবং পরম যত্নে আপনার বৈঠকখানা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার সে পূর্ব্ব সৌষ্ঠব না থাকিলেও অকালী সিংহের যত্নে কিছুই তেমন বিকৃত হইতে পায় নাই। স্বহস্তে অকালী রোজ প্রাতে আস্‌বাবগুলির ধূলি মার্জ্জিত করিয়া দিত, প্রভু যেখানে যাহা রাখিতেন তাহার কোন অন্যথা হইতে দিত না—প্রাতে সন্ধ্যায় প্রভুর তৈলচিত্রের প্রতিমূর্ত্তিখানি দেখিতে দেখিতে সজল-নেত্রে উদ্দেশে তাঁহাকে নমস্কার করিত। অনেক দিনের পর তাহার সেই দেবমন্দিরের সমস্ত দ্বার জানালা খুলিতে খুলিতে অকালী সিং মথিত হৃদয়ে বারম্বার অশ্রু ত্যাগ করিল। তার পর সম্মুখস্থ অযত্নরক্ষিত উদ্যানে কালেক্টর সাহেবের আহারাদির জন্ম একটা পুরাতন অসংস্কৃত তাঁবু খাড়া করাইয়া দিল, নিজের নিত্যকর্ম্মগুলি শেষ করিয়া তাহার জমাদার যখন অনেকদিনের রাঙ্গা পোসাক এবং জরি দেওয়া পাগড়ি মাথায় দিয়া দেউড়ীতে সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল, সুরোবালাকে ভগী তখন স্নান করাইতেছিল। কিন্তু সে খবর পাইবামাত্র সুরো ভিজে মাথায় ভিজে কাপড়ে দৌড়িয়া আসিয়া অকালী সিংকে দেখিতে দেখিতে হাসিয়া আকুল হইল। অন্য সময়ে অকালী এই হাস্যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত, আজ তাহার চক্ষে জল আসিল।

বড় তরফেও কালেকটর সাহেবের আগমনবার্ত্তা পৌঁছিয়াছে। ম্যানেজার গুরুতর আহত হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন। ভূতে তাঁহার সে দশা করিয়াছে প্রচার হওয়ায় মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেছে। কর্ত্রী ঠাকুরাণী শুনিয়া বলিলেন "দেখ্‌লে, পরের মন্দ করতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। ভাগ্যিস্ আমি মিছে

বল্‌তে রাজি হইনি।" কালেক্টর হঠাৎ আসিতেছেন শুনিয়া হরিপ্রিয়া সশঙ্কিতা হইয়া উঠিলেন। পথে তাঁহাকে ম্যানেজারের অভাবনীয় অবস্থার খবর দিবার জন্য ঘোড়সওয়ার রওনা হইয়া গেল।

বুদ্ধদেবের মনের ইতিহাস।

সেই জনতাবিহীন স্থানে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যমালার মধ্যে, নৈরঞ্জনা নদীর ধারে সিদ্ধার্থ ঘোর তপস্যা করিলেন। সে তপস্যার নাম কি? তাহার তাৎপর্য্য কি? কি উচ্চ কামনায় তিনি এই কঠোর ব্রতে ব্রতী হইলেন? শত শত বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে যোগ ধ্যানের পরাকাষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। সাধনের এমন কোন পথ ছিল না যাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। মহা ঋষিরা আধ্যাত্মিক জীবনের যত কিছু গূঢ় রহস্য ছিল সকলই প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ এমন কি চাহিতেছিলেন যাহা তাঁহারা দিতে পারেন নাই? এমন কি তৃষ্ণা হইয়াছিল যাহা তাঁহারা উপশম করিতে পারেন নাই? পাঠকগণ, এই দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক, নচেৎ আমরা শাক্যমুনির জীবনের ঘটনাসকল বুঝিতে পারিব না। সিদ্ধার্থ যখন পিতৃভবনে থাকিয়া দুঃখের পরিচয় পাইলেন, যখন তিনি কপিলবস্তুর পথ দিয়া বিচরণ করিতে করিতে জরা, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুকে সাক্ষাৎ করিলেন, তখন তাঁহার মনে এই ভাব হইল যে, পৃথিবীতে দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই নাই এবং কোন প্রকারে এই দুঃখের হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। তবে কি হইবে? তাঁহার পক্ষে কি কোন উপায় নাই? তিনি

দেখিলেন যে সংসারে থাকিলে মুক্তির কোন সম্ভাবনা নাই। মক্ষিকা যেমন কোন ফলের আটার মধ্যে পড়িলে যত তাহা হইতে নিস্তার পাইবার চেষ্টা করে, তত আরও তাহাতে জড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ কোন লোক সংসারে পড়িয়া যত তাহা হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করে ততই সে তাহাতে আরও সংশ্লিষ্ট হইয়া যায়। তবে কি দুঃখকে একেবারে পৃথিবী হইতে নির্ম্মূল করিয়া দেওয়া যায় না? এমন কি উপায় নাই, এমন কি কোন স্পর্শমণি নাই যাহার স্পর্শে দুঃখ সুখ হইয়া যায়, প্রত্যেক পদার্থ স্বর্ণ হইয়া যায়? সংসারে তাহা কখন হইতে পারে না, এই মীমাংসা তাঁহার মনে হইল। কেন না সংসার এক প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তনক্ষেত্র—ইহাতে দিনরাত্রি ছায়াবাজী চলিতেছে। ছায়ার ন্যায় পদার্থসকল আসিতেছে, যাইতেছে—কাহাকেও এক মুহূর্ত্তের অধিক ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না। সেই জন্য তিনি যখন বেড়াইতে বেড়াইতে পথিমধ্যে জনৈক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার মনে হইল যে, তবে ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া লোকে জীবিত থাকিতে পারে এবং যদি তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তাহা হইলে তিনি ত নিদেন সুখদুঃখের অতীত হইতে পারেন। পৃথিবীতে সুখ না হউক বা দুঃখ না হউক, কেহ যদি সুখদুঃখের অতীত হয়, তাহাই যে তাহার পক্ষে পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। এই মনে করিয়া তিনি সংসার ছাড়িলেন। কিন্তু সংসার ছাড়িয়াও তিনি যাহা চাহিতেছিলেন তাহা পাইলেন না। তিনি যত পলায়মান হইয়া দূরে যাইতে লাগিলেন তত তাঁহার শরীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল বটে, কিন্তু মনটা সংসারে পড়িয়া রহিল। পাঠক মনে রাখিবেন যে, কপিলবস্তু পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে মার অথবা পাপচিন্তা আসিয়া আক্রমণ করে। ইহাতে তাঁহার আর

একটি শিক্ষা হইল। শরীর পাপের কারণ হইলেও পাপের প্রকৃত আবাস মনে, এবং দুঃখের প্রকৃত কারণ মনের পাপচিন্তা। অতএব পাপচিন্তা, বিষয়বাসনা, সুখের কামনা, এই সকল থাকিতে আমরা স্বর্গবাসী হইলেও দুঃখের অতীত হইতে পারি না। ইহাতে সিদ্ধার্থ আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সংসার ছাড়িলেই মুক্তি, বৃক্ষের সুপক্ক ফলের ন্যায়, আপনাপনি হাতে আসিয়া পড়িবে। কিন্তু সে মুক্তি এখনও কোথায় আছে তিনি দেখিতে পাইলেন না, এবং তাহা প্রাপ্তব্য কি না তাহাও জানা নাই। তিনি মনের বেগে দৌড়াইতে লাগিলেন। সংসারে আর ফিরিবেন না। মন্ত্রের সাধন বা শরীর পতন—এই এক বচন লইয়া তিনি চলিতে লাগিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, রাজগৃহে অনেক ঋষি, যোগী এবং ব্রহ্মচারীরা বাস করেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই ব্রতে নিমগ্ন ছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের নিকট তিনি সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন। এই মনে করিয়া তিনি তাঁহাদিগের নিকট আসিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে রহিলেন এবং তাঁহাদিগের ন্যায় তিনি ঘোর সাধন আরম্ভ করিলেন। যে অভাবটি তাঁহার হইয়াছিল সেই অভাবটি ইহাঁদিগেরও হইয়াছিল এইটি তিনি বুঝিতে পারিলেন। মনের পাপ কিসে যায়? এটি তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহাঁরাও জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। ব্রহ্মচারীরা এই উদ্দেশ্যে অনেক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকলের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহা এই যে, শরীরকে তাড়না করিয়া, শরীরের অঙ্গসমূহকে যৎপরোনাস্তি নির্যাতন করিয়া মনকে প্রকৃতিস্থ করা। অর্থাৎ কিনা মনের পথ শরীরের ভিতর দিয়া। শরীরকে পোষণ করিলে মন পরিপুষ্ট ও সতেজ থাকে, কিন্তু শরীরকে নানামতে পেষণ করিলে মন হীন ও দুর্ব্বল হয়। সিদ্ধার্থ কিছুই জানিতেন

না। এত বড় বড় যোগী ঋষিরা যখন এই পথের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তখন তাহা গ্রাহ্য করিতেই হইবে। এই ভাবিয়া তিনিও ঘোর ব্রত ও তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রের হস্তে পরীক্ষা বলিয়া একটি প্রধান অস্ত্র আছে। সেই অস্ত্র সিদ্ধার্থ চালাইতে চালাইতে দেখিলেন যে, ঋষিরা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও সম্পূর্ণরূপে অলীক ও ভ্রান্ত। তিনি ত কেবল জ্ঞানবৃত্তি চরিতার্থ করিতে যান নাই। রাজপুত্রকে অনেক বিষয় জানিতে হয়, সেই জানিবার ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্রহ্মচারীদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। পণ্ডিতেরা যে সকল মতের পক্ষ সমর্থন করিয়া গিয়াছিলেন সে সকল মতের সত্যাসত্য বিচার করিতেও সেখানে যান নাই। তাঁহার জীবনে একটি মহা অভাব দেখা দিয়াছিল, মুক্তির জন্য তাঁহার ভয়ানক তৃষ্ণা হইয়াছিল, জীবলোকের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার মন নিরন্তর কাঁদিতেছিল। এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এটিও বিশ্বাস ছিল যে, তিনিই সে দুঃখ-রাশি দূর করিতে পারিবেন এবং সেই দুঃখরাশি দূর করা তাঁহারই জীবনের কার্য্য। সিদ্ধার্থের পক্ষে এই কথা জীবন মরণের কথা বলিতে হইবে। যদি তিনি ইহার মীমাংসা করিতে সক্ষম হন তাহা হইলে তিনি ইহাই প্রচার করিয়া জীবগণের মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন। আর যদি তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য না হন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রাণধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র, তাঁহার পক্ষে মৃত্যুই প্রার্থনীয়। এই ঘোর মন্ত্রের সাধন করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট শাস্ত্র কিম্বা অশাস্ত্রের বিবয় কিছুই ছিল না। যোগী ঋষি পণ্ডিতদিগের নাম তাঁহার নিকট কিছুই নহে। যাহা সত্য, যাহা যুক্তিসঙ্গত, যাহা কার্য্যে পরিণেতব্য তাহাই তাঁহার নিকট ধর্ম্ম। একজন বড়লোক কোন কথা বলিয়া-

ছিলেন বলিয়া যে সে কথা সত্য হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই। তিনি কায়মনোবাক্যে নিজেই সত্যসাধনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। অতএব ইহাতে অন্য কাহারও কথা চালাইবার কোন অধিকার ছিল না। তিনি শাস্ত্রসম্মত পথ সকল অবলম্বন করিলেন। যখন তাহাতে কোন ফল হইল না দেখিলেন, তখন তিনি নিজের পথ অবলম্বন করিলেন। জাতীয় আচার, শাস্ত্রীয় নিয়ম এ সকলকে অবজ্ঞা করিয়া যাহাতে মুক্তি হয় ইহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ভয়ানক কঠোর সাধন করিয়া দেখিলেন যে, তিনি একপদও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। শরীরের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিয়া বুঝিলেন যে, মন যেখানে ছিল সেইখানেই রহিল। ইহার কারণ কি ? ব্রহ্মচারীদিগকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কেন এত দুস্তর তপশ্চরণ করিতেছেন ?" তাঁহারা উত্তর দিলেন—"পরমার্থ পাইব বলিয়া।" তিনি বলিলেন—"পরমার্থ শব্দের অর্থ কি ?" তাঁহারা উত্তর দিলেন "পরকালে গিয়া ব্রহ্মপদ পাইব, বা ইন্দ্রত্ব পাইব, বা অন্য কোন দেবপদ পাইব। এজন্মে শরীরকে নির্যাতন করিলে পরজন্মে নিত্যসুখ উপার্জ্জন করিব।" সিদ্ধার্থ ভাবিলেন যে, পরজন্মের সুখ—ইহার অর্থ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে সম্ভোগ করা। পৃথিবীতে যে সুখ অল্প পরিমাণে হয়, যে সুখ ক্ষণস্থায়ী হয়, তাহা স্বর্গে অধিক পরিমাণে এবং অধিক কাল থাকে। কিন্তু সুখ কথাটি আপেক্ষিক ইহা তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। সে সুখ আমরা পৃথিবীতে সম্ভোগ করি বা স্বর্গে সম্ভোগ করি, উভয় স্থানে ইহা আপেক্ষিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেননা দেবপদ প্রাপ্ত হইলেই একটি নূতন শরীর সঙ্গে সঙ্গে যাইবে এবং শরীর থাকিলেই পরিবর্ত্তনও সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। এ সমুদয় জগত মায়াময়, ছায়াময়, সদা পরিবর্ত্তনশীল। ইহার কোন অংশই স্থির নিত্য

নহে। ইহার কোন পদার্থই একভাবে থাকে না। যাহাকে সুখ বলি তাহা আমার নিকট সুখ হইতে পারে, তোমার নিকট তাহা দুঃখ। কিম্বা তাহা এক মুহূর্ত্তে সুখ, অপর মুহূর্ত্তে দুঃখ। যে পদার্থকে আমি সুন্দর বলিয়া সুখী হই, সেটী হয়ত তোমার নিকট কদর্য্য এবং দুঃখকর। সিদ্ধার্থ যে সকল সুন্দরী রমণী লইয়া অনেক দিন সুখে কাল যাপন করিতেছিলেন, তাহাদিগকে নিদ্রাবস্থায় তিনি অতি কুৎসিতা ও কদাকারা দেখিয়াছিলেন, সুতরাং সুখ শব্দের অর্থ কি? আকাশের মেঘ কখন একটি মানুষের আকার কখন বা উষ্ট্রের আকার কখন কখন বা বৃক্ষের আকার, কত কত প্রকার আকার অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ধারণ করে। কোনটিকে এক মিনিটের অধিক চক্ষের সম্মুখে রাখিতে পারি না। এই একরূপ হইল, অব্যবহিত পরেই আর একরূপ হইল। জীবনের সুখ সেই প্রকার। যতদিন ইহা শরীরের সঙ্গে যুক্ত আছে, ততদিন শরীরের ন্যায় ইহারও পরিবর্ত্তন। ইহাকে সুখ বলা যায়, দুঃখও বলা যায়। অর্থাৎ ইহার প্রকৃত অর্থ কিছুই নাই। অতএব আমরা যদি স্বর্গে শরীর লইয়া যাই, তাহা হইলে শরীর সম্বন্ধীয় কামনা সকলও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে এবং কামনা হইতে যে সকল সুখ দুঃখ সম্ভূত হয় তাহাও যাইবে। এমন হইতে পারে যে, এখানে যে সুখ পাই তাহা ক্ষণিক, তাহা স্বর্গেতে অনেক কাল স্থায়ী হইবে। কিন্তু তাহাতে সিদ্ধার্থের কথার মীমাংসা হইল কোথা? অনিত্যের ভিতর থাকিলেই দুঃখ আসিবে, সুখে মন নিযুক্ত করিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আসে। তিনি এমন অবস্থা চাহিতেছিলেন যাহাতে মন সুখ দুঃখ উভয়ের অতীত হয়, অর্থাৎ চিরশান্তি অনুভব করে। আবার তিনি ইহাও দেখিলেন যে, শাস্ত্রে যে স্বর্গ বর্ণিত আছে তাহাতে পূর্ণ কামনা ও সম্ভোগের সমস্ত বিষয় আছে। স্বর্গে

দেবতাদিগের উপর ষড়রিপুর আধিপত্য আছে। দেবতাদিগের বিলাসভবনে অপ্সরীরা নিত্য বিরাজমানা। তাঁহারা কামদোষ বিবর্জ্জিত নহেন। পরস্পরের প্রতি হিংসা, দ্বেষ এবং নির্য্যাতন যথেষ্ট আছে। সুতরাং পৃথিবী হইতে দুঃখ বাদ দিয়া সুখের পৃথিবী করিয়া তাহাকে অনন্ত গুণ বাড়াইলে যাহা হয় তাহারই নাম স্বর্গ। কিন্তু সিদ্ধার্থ যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে, এরূপ অর্থে স্বর্গ বুঝাইলে তাহাতে বিষম ভ্রম লক্ষিত হয়। যেহেতু জগতে সুখ বলিয়া কোন একটি স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। ইহার পরিমাণ বা কাল বা অবস্থা কিছুরই স্থিরতা নাই। কেহ বলিতে পারেন না, আমি সুখ বলিয়া এই একটি পদার্থ পাইয়াছি এবং ইহা যতদিন আমার নিকট থাকিবে আমি সুখ বই আর কিছুই পাইব না। সুখ মনের একটি অবস্থা মাত্র এবং সে অবস্থাও অনেক প্রকার ঘটনার উপর নির্ভর করে। কেহ বলেন—"আমি ধন পাইয়াছি, অতএব আমি সুখী।" এখানে ধন একটি পদার্থ, সুখ তাহার ফল। কিন্তু ইহা কি কেহ বলিতে পারেন যে, ধন পাইলেই সুখ হয়? আমি অদ্য এক লক্ষ টাকা পাইয়া সুখী হইলাম। কল্য দুই লক্ষ হইল না বলিয়া মনে কষ্ট হইল। এখানে ধন সুখের কারণ কিরূপে বলিব? আমি শত শত ভোগ্যবস্তু লইয়া বিলাস আরম্ভ করিলাম। বিলাসের সুখ ভোগ্যবস্তুর উপর এবং আমার স্বাস্থ্য ও মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। অদ্য ভোগ্যবস্তু লইয়া সুখী হইলাম, কল্য শরীর অসুস্থ বলিয়া ভোগ্যবস্তুকে সম্ভোগ করিতে পারিলাম না। এখানে ভোগ্যবস্তু এবং আমার শরীর ও মন কোনটাই সুখের কারণ হইল না। সিদ্ধার্থ দেখিলেন যে, ঋষিরা দিব্য শরীর পাইবেন বলিয়া শরীরকে নিগ্রহ করিতেছেন, পরকালে সমস্ত কামনা চরিতার্থ করিতে পারিবেন বলিয়া ইহকালে

কামনা বিনাশ করিতেছেন। তিনি দেখিলেন যে, এরূপ তপস্যার ফল পাপ বিনাশ নহে, যেহেতু ঋষি মুনিরা পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা দীর্ঘকাল বনবাস করিয়া অনেক ধ্যান ও তপস্যা করিয়াও কামনিপীড়িত হন, ক্রোধে সময়ে সময়ে অস্থির হন এবং অন্যান্য রিপুদিগেরও আধিপত্য সহ্য করিতে হয়। তিনি দেখিলেন যে, মনুষ্যদিগকে সম্ভোগের দিক দিয়া, জ্ঞান, বুদ্ধি ও ক্ষমতার দিক দিয়া বাড়াইলেই তাহারা দেবতা হয়। দেবতা বলিয়া মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ও বিপরীত শ্রেণীর কোন পুরুষ নাই। দেবতাদিগকে কল্পনা করিতে গিয়া মনুষ্য নিজ স্বভাব অধিক পরিমাণে তাঁহাদিগকে আরোপ করিয়াছে। অতএব যে তপস্যায় মন হইতে পাপ যায় না, যাহাতে কামনা অগ্নির নির্ব্বাণ হয় না, যাহাতে সুখদুঃখের অতীত হওয়া যায় না, যাহাতে এই মায়াময় পরিবর্ত্তনশীল জগত চিরকাল মায়াময় ও পরিবর্ত্তনশীল রহিল, যাহাতে স্থির, নিত্য, ধ্রুব, অনন্ত বলিয়া কোন পদার্থই পাইলাম না, সে তপস্যা লইয়া কি হইবে? ঋষিরা কলুর ঘানির বলদের ন্যায়। বলদ দিনরাত্রি ঘানি লইয়া ঘুরিতেছে। এইরূপে সে শত ক্রোশ চলিয়া যায়। কিন্তু এই শত ক্রোশ এক ঘানির চারিদিকে—এক পদও অগ্রসর হইতেছে না। তাঁহারা এই সংসাররূপ ঘানি লইয়া ঘুরিতেছেন। সেই শরীর, সেই কামনা, সেই অনিত্য জগত, সেই সুখ দুঃখ তাঁহাদিগের বিচরনস্থল। এই সকল লইয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, ব্রত, তপস্যা, ধ্যান, চিন্তা ও জীবন। অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছেন। কিন্তু সেই শরীর, সেই কামনা, সেই সুখ, সেই দুঃখ, সেই জগত তাঁহাদিগকে ছাড়িতেছে না। স্বর্গকেও সেই সংসার বলিয়া কল্পনা করিয়া লইতেছেন। এখানে সুরা, সেখানে সোমরস, এখানে

নায়িকা, সেখানে অপ্সরী, এখানে পদ্ম, সেখানে পারিজাত, এখানে জরা মৃত্যু, সেখানে অনন্ত যৌবন। সেই এক ঘানি লইয়া ঘুরিতেছেন, একপদও সম্মুখে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই।

এইরূপ চিন্তা করিয়া সিদ্ধার্থ ঋষিদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। পৃথিবী কেবল দুঃখময় এবং সমুদয় দুঃখের কারণ কামনা এই দুইটি সত্য তিনি সংসারে থাকিয়া কথঞ্চিৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এতএব তাঁহার মনে হইল যে, সংসার পরিত্যাগ করিলেই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু সংসার ছাড়িতে না ছাড়িতেই তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার মনে পাপচিন্তা আসিতেছে। কামনা শরীরসম্ভূত, এই মনে করিয়া তিনি ঋষিদিগের সঙ্গে, ঋষিদিগের অনুমোদিত উপায়সকল অবলম্বন করিয়া শরীরকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার কামনা গেল না, পাপচিন্তা গেল না। ইহার কারণ কি? তিনি ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা উত্তর দিলেন যে, শরীরকে তাড়না করিলে পাপ যায়; পাপ গেলে স্বর্গে পরম পদ লাভ হয় এবং তাহা হইলেই দুঃখ চিরকালের জন্য চলিয়া যায়। এ যুক্তিতে ত সিদ্ধার্থের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত ছিল। যেহেতু দুঃখ চলিয়া যায় ইহা তিনিও চাহিতেছিলেন। ঋষিদিগের মতে ইহলোকে কঠোর সাধন করিলে পরলোকে অনন্ত সুখ ভোগ করা যায়। সুতরাং দুঃখও আর থাকে না। কিন্তু সিদ্ধার্থ তাহা বুঝিলেন না। তাঁহার তীক্ষ্ণ ন্যায়শাস্ত্র ঋষিদিগের অন্যায়বাদ একেবারে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। স্বর্গে যে সুখ হয়, তাহা কি? উত্তর, পৃথিবীর সুখ অনন্তগুণ বাড়াইলে যাহা হয় তাহাই স্বর্গের সুখ। অর্থাৎ, অনন্ত বিলাস, বাসনা, কাম্যবস্তু, অনন্ত যৌবন ও ইন্দ্রিয়সুখ। স্বর্গের সুখও তবে শরীর লইয়া। এখন

বুঝিতে হইবে যে, শরীর কখন নিত্য হইতে পারে না। সুতরাং শরীরসম্ভূত সুখও কখন নিত্য হইতে পারে না। অধিক কি, সে সুখ সুখই নহে, তাহা দুঃখ। দেবতারা কি সুখী? কখনই নহে। তাঁহাদিগের মত দুঃখী কেহই নহে—মনুষ্যেরাও তত দুঃখী নহে। কেন না মনুষ্যদিগের দুঃখ জীবিতাবস্থায় থাকে—কেবল এক শত বৎসর ধরিয়া। কিন্তু দেবতাদিগের দুঃখ অনন্তকাল থাকে। তাঁহাদিগের স্বর্গ ত স্বর্গ নহে—ইহা যে প্রকৃত নরক। যেখানে অহোরাত্র অগ্নি জ্বলিতেছে—অর্থাৎ কামনার অগ্নি জ্বলিতেছে—তাহাই ত নরক। তাহা হইলে কঠোর তপস্যাবলে ঋষিরা পৃথিবী বলিয়া যে নরক অল্পকাল স্থায়ী তাহা স্বর্গ বলিয়া অনন্ত নরকে পরিণত করিয়াছেন। পাঠকেরা বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন, কি অসাধারণ ন্যায়সঙ্গত যুক্তিবলে সিদ্ধার্থ এক কোপে নানা ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত স্থানীয় স্বর্গ সম্বন্ধীয় মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। লোকে যাহাকে স্বর্গ বলে তাহা থাকিতে পারে না, তাহা ভ্রম, অলীক, ইহা তিনি একেবারে চিরকালের জন্য মীমাংসা করিয়া দিলেন। এখন প্রকৃত স্বর্গ কোথায় ইহার অনুসন্ধানে তিনি পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন। এই উদ্দেশে তিনি উরুবিল্ব গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন।

কাব্যে প্রকৃতি।

শেক্ষপীয়রের নাটক পড়িতে পড়িতে একটা কথা মনে হয় যে, শেক্ষপীয়র সমস্ত হৃদয়ে প্রকৃতিকে ভালবাসিলেও প্রকৃতির সহিত তাঁহার সামাজিকতা বড় নাই। এবং তাঁহার নাটকে নাটকীয়

চরিত্র ও ঘটনাবলীর উপর প্রকৃতির যে প্রভাব লক্ষিত হয়, তাহা কেবল ছায়ার মত চতুর্দ্দিকের মানবহৃদয়ে ও ঘটনার উপরে ঘনাইয়া আসে মাত্র; কিন্তু সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের ন্যায় প্রকৃতি সেখানে মানবজীবনের সহিত বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া মানবহৃদয়ের সহ-মর্ম্মিণী সঙ্গিনী হইয়া উঠে নাই, এবং মানবী সখীর সুখে দুঃখে মানবীর ন্যায় সে বিচলিত হয় না বা মানবীর বিরহে একান্ত সন্তপ্ত ও মিলনে অতিমাত্র হৃষ্টও হয় না।

যেখানে সমগ্র নাটকটিকে শেক্ষপীয়র লোকালয় হইতে বহুদূরে এক জনহীন দ্বীপে লইয়া ফেলিয়াছেন, সেখানেও প্রকৃতির সহিত তাঁহার পারিবারিক প্রীতি সংস্থাপিত হয় নাই—প্রকৃতির অনেক-গুলি দানবী শক্তি যেখানে নির্ব্বিবাদে আধিপত্য করিতেছিল সেই-খানে তিনি এক মহামহিম মানবপ্রভুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। এই মানব প্রভু প্রস্পেরোকে বন্য শক্তি আরিয়েল ও ক্যালিবান যমের মত ভয় করিয়া চলে এবং যদি কালক্রমে এই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া আপন স্বাধীনতা ফিরিয়া পায় এই আশায় দাসের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে। কিন্তু প্রস্পেরো অথবা মিরান্দার সহিত এই সকল প্রাকৃতিক শক্তির কাহারও কোনরূপ সমকক্ষতা নাই এবং বহুদিন একত্র বাসে পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতাও জন্মে নাই। কেবল,প্রস্পেরো আদেশ করেন,আরিয়েল ও ক্যালিবান্ —প্রকৃতির দুই বিভিন্ন শক্তি—স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই আদেশ পালন করে। প্রস্পেরো বলেন, ঝড় উঠাও; প্রকৃতির সমস্ত শক্তি সাগরে তরঙ্গ তুলে, আকাশে বজ্রধ্বনি করে,পৃথিবীতে প্রলয়ের রোল উঠাইয়া দেয়। প্রস্পেরো বলেন, এই চাহি—দাসেরা তাহাই সং-সাধন করে। শেক্ষপীয়রে প্রকৃতির উপর মানব জয়ী হইয়াছে—প্রকৃতির উপর সে কর্তৃত্ব করে, প্রকৃতির সহিত ঘর করে না।

কিন্তু সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে প্রকৃতি মানবের সহিত সমান আসন পাইয়াছে এবং পরস্পরের প্রতি প্রীতিতে উভয়ের মধ্যে একটি সুমধুর গার্হস্থ্য বন্ধন সংস্থাপিত হইয়াছে। ভবভূতির নাটকে তমসা মুরলা বাসন্তী প্রভৃতি নদনদী ও আরণ্য প্রকৃতি সীতার দুঃখে যেরূপ সমবেদনা অনুভব করিয়াছে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে যেরূপে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছে তাহা শেক্ষপীয়রে নিতান্ত দুর্লভ। রাম যখন বনে আসিলেন, তখন সীতার দুঃখরজনী অবসান আশায় সেই গোদাবরী-প্রদেশের বন্য প্রকৃতি কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিল! পরিপাণ্ডু-দুর্ব্বলকপোলসুন্দর বিলোলকবরী মূর্ত্তিমতী করুণা বা শরীরিণী বিরহব্যথার ন্যায় জানকীর বর্ণনায় তমসার কত প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে! বাসন্তী রামকে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ছত্রে ছত্রে সীতার প্রতি তাঁহার কি গভীর সহানুভূতি ব্যক্ত হইয়াছে! এমন শুশ্রূষাপরায়ণা সান্ত্বনাদায়িনী প্রকৃতি ইংরাজি নাটকে কোথায়? এই প্রেমে করুণায় শুশ্রূষাপরায়ণতায় উত্তরচরিতের প্রকৃতি দেবী হইয়া উঠিয়াছে।

কালিদাসের নাটকেও প্রকৃতি এইরূপ মানবেরই সখী। শকুন্তলার সখিগণের নাম করিতে হইলে প্রিয়ম্বদা অনসূয়ার সহিত সেই মালিনীতীরস্থা শ্যামলা প্রকৃতিরও উল্লেখ করিতে হয়। তপোবনের প্রতি তরুলতার সহিত শকুন্তলার সোদরস্নেহের সম্বন্ধ। এবং শকুন্তলার বিদায়কালে প্রিয়ম্বদা অনসূয়ার চক্ষু যেমন জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, অসহায় হরিণশিশু যেমন অঞ্চল ধরিয়া টানিয়া গমনোদ্যতা শকুন্তলাকে বারবার নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তপোবনের এই পল্লবিত প্রকৃতিও সেইরূপ অশ্রুছলছল নতনেত্রে আপন নির্ব্বাক্ বেদনা জানাইয়া শাখাবাহু দ্বারা প্রিয়সখীকে বুকভরা আলিঙ্গন দিয়াছিল।

শকুন্তলায় এই প্রকৃতি নাটকের মেরুদণ্ড। মানবী সখী যখন শকুন্তলার বল্কল-বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়, প্রকৃতি তখন কুরবকশাখায় বল্কল আট্‌কাইয়া দিয়া মানবী সখীর সহিত সেই প্রণয়ব্যাপার ঘনাইয়া আনে। দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেমকে তপোবনের এই রমণীয় প্রকৃতি যেন ভরাট্‌ করিয়াছে। এই প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে শকুন্তলায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—দুষ্মন্ত শকুন্তলা প্রিয়ম্বদা অনসূয়া কণ্ব গৌতমী সমস্ত মিলিয়া একটি নির্জ্জীব মানবস্তূপ পড়িয়া থাকে মাত্র—এবং কালিদাসের প্রেম সহসা অত্যন্ত শিথিল ও ক্ষণিক বলিয়া মনে হয়।

কেবলি শকুন্তলায় নহে, কুমারসম্ভবে যেখানে মহাদেবের প্রতি মদন বাণ উদ্যত করিয়াছে সেখানেও সমস্ত প্রকৃতি অনুকূল ভাবে পূর্ণ হইয়া হরপার্ব্বতীর প্রেমকে সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণ করিয়াছে। কালিদাসে মানবপ্রেম আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে—চতুর্দ্দিক্‌ হইতে তাহার উপরে প্রকৃতি ঘনাইয়া আসিয়া সেই প্রেমকে সম্পূর্ণ করে। এই জন্য যোগীজনবিচরিত তপোবনেই তাঁহার প্রেম সম্পূর্ণ সফল হয়—যেখানে আরণ্য প্রকৃতি মানবের স্নেহে সিঞ্চিত হইয়া কোমল ও মধুর হইয়া আসিয়াছে এবং মানব-হৃদয় নাগরিকতা পরিহারপূর্ব্বক আরণ্য শ্যামলতায় সরস হইয়া উঠিয়াছে; যেখানে হিংসা নাই দ্বেষ নাই, সিংহ মৃগশিশুকে হত্যা করে না, মৃগশিশু মানবের পদপ্রান্তে বসিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নীবার রোমন্থ করে, এবং সর্ব্ব লোক সর্ব্ব জীব চেতন অচেতন জড় সকলের মধ্যে একটি প্রীতিশুভ্র পারিবারিকতা সংস্থাপিত হয়।

শেক্‌স্পীয়রে প্রেমের সহিত প্রকৃতির এত ঘনিষ্ঠতা দেখা যায় না। সেখানে সুখসুপ্ত চন্দ্রালোকে প্রণয়ীযুগলের মনে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের বহু প্রণয়কাহিনী আসিয়া উদয় হয় এবং পুরাতন কালের

সমস্ত প্রেম এই নবীন প্রেমে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। এবং এইরূপে যুগযুগান্তের মানবপ্রেম আসিয়া মানবকে আপনার মহিমায় অধিকতর ফুটাইয়া তুলে। কিন্তু প্রকৃতি সেখানে মানবের সখীরূপে ফুটে না—হয়, ছায়ার মত, নয়, মানবের আজ্ঞাধীন সেবকরূপে অবস্থিতি করে। যেমন, মার্চ্যাণ্ট অফ্ ভেনিসে লোরেঞ্জো ও জেসিকার প্রণয়দৃশ্যে, অথবা টেম্পেষ্টে ফার্দিনান্দ ও মিরান্দার প্রণয়ঘটনায়।

সংস্কৃত কবিরা প্রকৃতিকে স্ত্রীরূপে দেখেন। সেই জন্যই সংস্কৃত নাটকে প্রকৃতি মানবের সহকারিণী সখী। ভবভূতির নিকট তিনি শুশ্রূষাপরায়ণা গম্ভীরহৃদয়া; এবং কালিদাসের নিকট তিনি সুন্দরী। কালিদাস নারীকে সৌন্দর্য্যেই সম্যক্ দেখিয়াছেন—প্রকৃতিকেও তিনি এই ভাবেই উপভোগ করেন।

কিন্তু এই সৌন্দর্য্য উপভোগে আধুনিক কবিদিগের সহিত কালিদাসের অনেক প্রভেদ। সেকালের কবি যেমন রমণীকে, অল্প হউক্ অধিক হউক্, পুরুষের ভোগ্যা বলিয়া জানিতেন, প্রকৃতিকেও কতকটা সেই ভাবেই দেখিয়াছেন। সেই জন্য কালিদাস যখন প্রিয়াসহ সুরম্য হর্ম্ম্যমধ্যে দীর্ঘ বর্ষযাপন করেন, ছয় ঋতু আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন মদিরা দিয়া তাঁহার পাত্র ভরিয়া দেয় এবং সুন্দরী দাসীর ন্যায় তাঁহার পরিচর্য্যা করে।

ভবভূতিতে যে প্রকৃতি দেবী হইয়া উঠিয়াছেন তাহার কারণ এই যে, ভবভূতির প্রকৃতি জননীর ন্যায় শুশ্রূষাপরায়ণা ও কল্যাণদায়িনী। আমাদের দেশে নারী সৌন্দর্য্যে পূজিতা নহেন; জননী ও সতীরূপে—গৃহের কল্যাণ ও আনন্দরূপেই তিনি এদেশের পূজা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। প্রকৃতিও যখন আমাদের নিকট এই ভাবে প্রতিভাত হয় তখনই আমরা তাহাকে দেবী করিয়া তুলি।

য়ুরোপে শিল্পরি নারীকে অন্যরূপে দেখিয়াছে। সেখানে

নারীর প্রতিষ্ঠা সৌন্দর্য্যে। সেখানে কবিদিগের রচনায় যে সৌন্দর্য্যের পূজা প্রচারিত হইয়াছে সে সৌন্দর্য্য কেবল ইন্দ্রিয়মাত্রের দ্বারা উপভোগ্য নহে। জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের অন্তরে যে সৌন্দর্য্যশক্তি নিহিত আছে নারীসৌন্দর্য্যে তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট বলিয়া নারীপূজায় সেই সৌন্দর্য্যেরই পূজা করা হয়। এবং এই সৌন্দর্য্যপূজা নারী হইতে ক্রমে সমস্ত প্রকৃতিতে যেন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আধুনিক কবি এই সৌন্দর্য্যশক্তিকে অদৃশ্য প্রভাবের মত অনুভব করেন। বসন্তের বাতাস যেমন চঞ্চল পক্ষে ফুলে ফুলে নিশ্বাস ফেলিয়া বহিয়া যায়, এই অদৃশ্য প্রভাবের ছায়াও সেইরূপ সর্ব্ববিশ্বের উপর দিয়া—লোক লোকান্তর স্পর্শ করিয়া—প্রবাহিত হয়। এই অদৃশ্য প্রভাব—এই ছায়া—শুধু সঙ্গীতের স্মৃতির মত—অত্যন্ত রহস্যময়, কিন্তু এই রহস্যবশতঃই প্রিয়তর। এই সৌন্দর্য্যের মূলশক্তি বাহ্য প্রকৃতিতে মানবহৃদয়ে প্রেমে আশায় স্বপ্নে সর্ব্বত্র ছায়া ফেলিয়াছে। কবি এই চরাচরপ্লাবী সৌন্দর্য্যরহস্যে নিমগ্ন হইয়া দেখিতেছেন যে, এই সমস্তই সেই মহাসৌন্দর্য্যে ওতপ্রোত; এবং এই সৌন্দর্য্য অবলম্বন করিয়াই মানবের অন্তরের সহিত প্রকৃতির অন্তরের অনির্ব্বচনীয় যোগসূত্রে নিবদ্ধ রহিয়াছে।

সৌন্দর্য্যের এই অদ্বৈতবাদই আধুনিক পাশ্চাত্য কবিতার মর্ম্মস্থল। ইহাকে অদ্বৈতবাদ না বলিয়া ঐক্যবাদ বলা উচিত। সমস্ত চরাচর চেতন অচেতনের মধ্যে যে একমাত্র মহীয়সী সৌন্দর্য্যশক্তি উদ্ভাসিত ইহাতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।—

এই অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি দ্বারা সমস্ত খণ্ড জগৎ একটি সর্ব্বব্যাপী সুমধুর মিলনে আবদ্ধ হইয়া একটি অখণ্ড সঙ্গীতের ন্যায় বৃহৎ এবং এক হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গীতের বিচ্ছিন্ন সুরগুলি স্বতন্ত্র ভাবেও শ্রুতিমনোহর হইতে পারে, কিন্তু যখন তাহাদের মধ্যে

আদ্যোপান্ত একটি অবিভক্ত সৌন্দর্য্য একটি মহা রাগিণীর সমগ্রতা আবিষ্কার করা যায় তখন আনন্দ সুনিবিড় হইয়া উঠে এবং একটি বিপুল রহস্যময় পুলকে সমস্ত অন্তরাত্মা চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের ন্যায় আন্দোলিত হইতে থাকে। প্রাচীন কাব্যে প্রকৃতি কোথাও এরূপ সম্মিলিত সমতানে অনাদ্যন্ত নভস্তল হইতে মানবের অন্তর গুহা পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। সেখানে খণ্ড প্রকৃতি—খণ্ড সৌন্দর্য্য—মানবের সাহচর্য্য করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এক বিশ্বব্যাপিনী মহীয়সী সত্তা মানবাত্মাকে চরাচরের সহিত সৌন্দর্য্য-পুষ্পমাল্যে আবদ্ধ করিয়া মহীয়ান্ করে নাই।

কেবল আমাদের প্রাচীনতম কাব্যগ্রন্থে বেদে এই মহাসঙ্গীত উদ্গীত হইয়াছে। তেমন সহজে তেমন সতেজে তেমন সংক্ষেপে আর কোন দেশের কোন কাব্যে জগতের এই রহস্যবার্ত্তা প্রচারিত হয় নাই। ঋষিরা বলিয়াছেন—

> আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
> আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
> আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

আনন্দ হইতেই সমস্ত প্রাণী জন্মলাভ করিয়াছে, আনন্দের দ্বারাই সমস্ত প্রাণী জীবিত রহিয়াছে এবং আনন্দের অভিমুখেই প্রবেশ করিতেছে।

ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে সকল কথাই বলা হইয়াছে। সমস্ত সৌন্দর্য্য সমস্ত সুখ সমস্ত চেতনা সমস্ত প্রাণ এক অনাদি অনন্ত মহানন্দের দ্বারা সন্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে—সেই জগচ্চরাচরের জগদতীত আনন্দঐক্য যে মহাত্মা অনুভব করিতে পারিয়াছেন তিনি আর

> ন বিভেতি কুতশ্চন,
> ন বিভেতি কদাচন।

বঙ্কিমচন্দ্র।

গতবর্ষ শেষ হইবার অনতিপূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালের জন্য আমাদের মধ্য হইতে অপসৃত হইয়া গিয়াছেন।

যে সকল রাজ্যে মহত্ব বিরল নহে সেখানে কোন যশস্বী লোকের অন্তর্দ্ধান হইলে সমস্ত দেশ শোক করিতে থাকে। আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে শুভ দৈববশে কদাচিৎ ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তথাপি, জীবনের কার্য্য সমাধা করিয়া যখন তাঁহারা সংসারক্ষেত্র হইতে অন্তরিত হন তখন এই জড়তাপন্ন দরিদ্র দেশ তাঁহাদের অভাব যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

কিন্তু একথা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না। লেখনী সহজেই লিখিতে চাহে যে, অদ্য সমস্ত বঙ্গদেশ বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগদুঃখে শোকাতুর। যদি সত্যই বঙ্গদেশের সেই বেদনাবোধ থাকিত তবে আজিকার এই চিরবিচ্ছেদের মধ্যেও সান্ত্বনার রশ্মি প্রকাশ পাইত।

অল্প দিনের মধ্যে আমাদের অনেকগুলি শোকের কারণ ঘটিয়াছে। প্রথমে রাজেন্দ্রলাল মিত্র চলিয়া গেলেন; কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি তাঁহাকে ভাল করিয়া বিদায়-সম্ভাষণ করিল না। সেই নির্ভীক মনস্বী পুরুষ দেশের জন্য তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানবিস্তার এবং লোকহিতের জন্য যাহা করিয়াছিলেন বিষয়ী লোক আপনার বৈষয়িক উন্নতি আপন স্বার্থসাধনের জন্য এত চিন্তা এত চেষ্টা এত সংগ্রাম করিতে পারে না। যে ক্ষেত্রেই ইংরাজ বাঙ্গালীর মধ্যে বিরোধ ঘটিত, সেইখানেই রাজেন্দ্রলাল দুর্ব্বল স্বদেশের পক্ষ লইয়া বীরগর্ব্বে অগ্রসর হইতেন; স্বদেশী বিদেশী কাহারও সাহায্য না পাইতেন তথাপি অটল একাকী দণ্ডায়মান হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি যুদ্ধে

চিরকাল অপরাঙ্মুখ এবং অপরাজিত ছিলেন। এইরূপে অশ্রান্ত নিরলস থাকিয়া অহর্নিশি কঠিন পরিশ্রমে দেশের জন্য তিনি যে জীবন অকালে বিসর্জ্জন করিলেন,দেশ তাঁহার সেই দুর্ম্মূল্য জীবনের অবসানে অকৃত্রিম শোকের এক বিন্দু অশ্রু ব্যয় করিয়াছিল কি না সন্দেহ।

রাজেন্দ্রলালের অধিকাংশ রচনা ইংরাজিতে। বিবিধার্থসংগ্রহ প্রকাশ করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি সাধনের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও বহুপূর্ব্বের কথা। এই কারণে, যদিও তাঁহার নাম দেশবিখ্যাত ছিল তথাপি তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে সে কথা বলা যাইতে পারে না।

বিদ্যাসাগর সমস্ত প্রাণমন সমর্পণ করিয়া একাকী দুর্দ্ধর্ষ তেজে দুঃসাধ্য কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। কাহারও স্তুতিনিন্দা কাহারও সহায়তার কোন অপেক্ষা রাখেন নাই। যখন সহস্র লোকের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন তখনও তিনি একক, যখন সহস্র লোকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন তখনও তিনি একক। সুমহৎ সুদুর্ভর কার্য্যভারসকল তিনি চিরজীবন অসামান্য সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের সহিত একাকী বহন করিয়াছেন। বঙ্গভাষার প্রথম স্তর তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বিধবার দুঃখমোচনের জন্য নিষ্ঠুর সমাজের সহিত তিনি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিয়াছেন, দেশের বিদ্যাশিক্ষা স্বদেশীয়ের দ্বারা সাধন করিবার ভার লইয়া তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং এই অলস অকর্ম্মণ্য অনুদার দেশে আপনাকে একনিষ্ঠ পরহিতব্রত অধ্যবসায় ও নিঃস্বার্থ বদান্যতার উজ্জ্বলতম আদর্শস্থল করিয়া তুলিয়াছেন—আর যে বঙ্গদেশ তাঁহার জীবনের রক্তে জীবন পাইয়াছে আজ বহু কষ্টে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার উপলক্ষে দুইচা

সামান্ত ব্যর্থ চেষ্টা দেখাইয়াই আপনাকে ঋণমুক্ত জ্ঞান করিয়া সম্পূর্ণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে।

আজ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও আমরা সভা ডাকিয়া সাময়িক পত্রে বিলাপসূচক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছি। তাহার অধিক আর কিছুতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় না। প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা বা কোনরূপ স্মরণ-চিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে জানা গিয়াছে যে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অধিক। উপর্য্যুপরি বারম্বার অকৃতজ্ঞতা ও অনুৎসাহের পরিচয় দিলে ক্রমে আর আত্মসম্ভ্রমের লেশমাত্র থাকিবে না, এবং ভবিষ্যতে প্রবন্ধ লিখিয়া শোকের আড়ম্বর করিতেও কুণ্ঠিত বোধ করিতে হইবে।

উপকার গ্রহণ করিবার শক্তির সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতার শক্তিও বাড়িতে থাকে। আমাদের দেশের জাতীয় স্বাস্থ্যের অবস্থা এখনও সেরূপ দাঁড়ায় নাই যাহাতে আমরা কোন মহৎলোকের দৃষ্টান্ত বা কার্য্য অন্তরের মধ্যে যথার্থরূপে পরিপাক করিয়া লইয়া তাহার ফল উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের কানের কাছে ক্রমাগতই বলা আবশ্যক, তোমার এতখানি উপকার করা হইল, তুমি এতটা লাভ করিলে, তোমার এতখানি পথ নিষ্কণ্টক হইল, অমুক তোমার এত বড় সুহৃদ্। এইরূপে কৃত্রিম উপায়ে মন্থন করিয়া কথঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা হৃদয়ের উপরিভাগে ফেনিল করিয়া তোলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে কোনরূপ স্থায়ী পদার্থে পরিণত করা যাইতে পারে না। দেখিতে দেখিতে কতকটা বাষ্প বিসর্জ্জন করিয়া কোথাও কোন চিহ্নমাত্র না রাখিয়া তাহা বিলীন হইয়া যায়।

যে দেশের এমন দুরবস্থা সেই দেশেই মহৎ লোকের নিঃস্বার্থ

আত্মবিসর্জ্জনের আবশ্যক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সহায়তা নাই, কৃতজ্ঞতা নাই, অনুকূলতা নাই, কেবল আপনার অন্তরের অপ্রতিহত ধৈর্য্য ও উপবাসসহিষ্ণু অকাতর অনুরাগে চিরজীবন একাকী বসিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

সেই জন্য যে কয়েকটি মহাত্মা আমাদের দেশের কাজে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগকে মিসরের বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে গুটিকতক নিঃসঙ্গ পিরামিডের মত দেখিতে হয়। এই মৃত সমভূমির মধ্যে তাঁহাদের সমুন্নত মহিমা দ্বিগুণ দেদীপ্যমান হয় বটে কিন্তু সেই সঙ্গে একটি সুবিশাল বিষাদ হৃদয়কে বাষ্পাকুল করিয়া তোলে। হায়, এত বড় জীবন যাহার নিকট নিঃশেষে সমর্পিত হইয়াছে সে জানিতেও পারিল না তাহার কি সৌভাগ্য এবং সে চিরদিনের জন্য কতখানি লাভ করিল।

ভাবসম্পদকে আমরা এখনও যথার্থ সম্পদরূপে গণ্য করিতে শিখি নাই। সাহিত্যরস যে আমাদের জীবনের খাদ্যপানীয়ের ন্যায় অত্যাবশ্যক তাহা এখনও আমরা সম্যক্ অনুভব করি না। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃজনী শক্তি মাতৃভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া বাঙ্গালীর জীবনের মজ্জার মধ্যে যে প্রবেশ করিয়াছে, বঙ্কিমের প্রতিভা-উৎসের ভাবপ্রস্রবণ হইতে বাঙ্গালী যে নূতন জীবন-রস প্রাপ্ত হইয়াছে, বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল বঙ্কিমের আবির্ভাবের পরে বাঙ্গালীর জীবনের গঠনে যে তদপেক্ষা এক নূতন বৈচিত্র্যের সঞ্চার হইয়াছে তাহা এখনও আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

এই স্থলে যদি আমি প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত নিজের জীবনের সম্বন্ধ আলোচনা করি তবে ভরসা করি শ্রোতৃগণ আমার প্রগল্ভতাকে অহমিকা জ্ঞান করিয়া অপরাধ লইবেন না। আ... এই শোকের দিনে বঙ্কিমের নিকট কেবল স্বজাতির ন...

নিজের বিশেষ কৃতজ্ঞতাঋণ স্বীকার করিবার জন্য আবেগ উপস্থিত হয় এবং তাহা দমন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করি না।

সৌভাগ্যক্রমে আমরা বাল্যকালে বাঙ্গলাভাষায় বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। স্বল্প ইংরাজি যাহা শিখিতাম তাহার মধ্য হইতে হৃদয়ের পোষণযোগ্য তৃপ্তিজনক কোন রস আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা ছিল না। অথচ তৃষ্ণা যথেষ্ট ছিল। কৃত্তিবাস, কাশিরাম দাস, একত্র বাঁধানো বিবিধার্থসংগ্রহ, আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, বাঙ্গলা রবিন্‌সন্ ক্রুশো, সুশীলার উপাখ্যান, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের জীবনচরিত, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি তখনকার কালের গ্রন্থগুলি বিস্তর পাঠ করিয়াছিলাম। তখন বাঙ্গলা গ্রন্থের সংখ্যা অল্প ছিল এবং বালকদিগের পাঠের অযোগ্য গ্রন্থও অনেক বাহির হইত। এবং আমরা অপরিতৃপ্ত আগ্রহের সহিত ভালমন্দ সকল গ্রন্থই নির্ব্বিচারে পাঠ করিতাম। তরুণ হৃদয়ের সেই স্বাভাবিক ক্ষুধা উদ্রেকের সময় বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তখন যে নূতন আস্বাদ, নূতন আনন্দ, নূতন জীবন লাভ করিয়াছিলাম তাহা কোন কালে ভুলিতে পারিব না।

তখনকার বয়স্ক লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে কিরূপভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস সম্পূর্ণ মনে নাই। যেটুকু মনে পড়ে তাহাতে বোধ হয় বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রূপ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর এক দল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল। এবং ক্ষুদ্র যে লেখকসম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের চেষ্টা করিত তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে ক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।

পর এখনকার যে নূতন পাঠক ও লেখক সম্প্রদায় উদ্ভূত

হইয়াছেন তাঁহারাও বঙ্কিমের পরিপূর্ণ প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ পান নাই; তাঁহারা বঙ্কিমের গঠিত সাহিত্য-ভূমিতেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, বঙ্কিমের নিকট যে তাঁহারা কতরূপে কতভাবে ঋণী তাহার হিসাব বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।

কিন্তু আমাদের সহিত যখন বঙ্কিমের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় তখন সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনরূপ পূর্ব্বসংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই এবং বর্ত্তমান কালের নূতন ভাব-প্রবাহও আমাদের নিকট অপরিচিত অনভ্যস্ত ছিল। তখন বঙ্গ-সাহিত্যেরও যেরূপ প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত আমাদেরও সেইরূপ বয়ঃ-সন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করি-লেন, আমাদেরও হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল।

পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা আনন্দউচ্ছ্বাসের সহিত আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। দুই কালের সন্ধিস্থলে যাহারা না দাঁড়াইয়াছে তাহারা সেই প্রবল প্রভেদ কিছুতেই অনুমান করিতে পারিবে না। কোথায় গেল সেই অন্ধকার,সেই একাকার,সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই সব বালকভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গ-দর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত "সমাগতো রাজবদুন্নত-ধ্বনিঃ।" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য কত উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিক পত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত

তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

আমরা কিশোরকালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নব-সমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম। সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল তাহা অনুভব করিয়াছিলাম—সেই জন্য আজ মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। মনে হয় সে দিন হৃদয়ে যে এক অপরিমেয় আশার সঞ্চার হইয়াছিল তদনুরূপ ফল লাভ করিতে পারি নাই। সে জীবনের বেগ এখন আর নাই। কিন্তু এ নৈরাশ্য অনেকটা অমূলক। প্রথম সমাগমের প্রথম প্রবল উচ্ছ্বাস কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। সেই নব আনন্দ নবীন আশার স্মৃতির সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করাই অন্যায়। বিবাহের প্রথম দিনে যে রাগিণীতে বংশি-ধ্বনি হয় সে রাগিণী চিরদিনের নহে। সে দিন কেবল অবিমিশ্র আনন্দ এবং আশা, তাহার পর হইতে বিচিত্র কর্ত্তব্য, মিশ্রিত দুঃখ সুখ, ক্ষুদ্র বাধা বিঘ্ন, আবর্ত্তিত বিরহ মিলন—তাহার পর হইতে গভীর গম্ভীরভাবে নানা পথ বাহিয়া নানা শোকতাপ অতিক্রম করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হইতে হইবে—প্রতিদিন আর সে নহবৎ বাজিবে না। তথাপি সেই এক দিনের উৎসবের স্মৃতি কঠোর কর্ত্তব্য-পথে চিরদিন আনন্দ সঞ্চার করে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত যে দিন নবযৌবনপ্রাপ্ত [illegible]বের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন সেই দিনের সর্ব্বব্যাপী প্রফু-[illegible] এবং আনন্দউৎসব আমাদের মনে আছে। সে দিন আর [illegible] আজ নানা লেখা নানা মত নানা আলোচনা আসিয়া উপ-[illegible]ইয়াছে—আজ কোন দিন বা ভাবের স্রোত মন্দ হইয়া [illegible]ান দিন বা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। কত লোক

আপনাকে প্রধান মনে করে; আপনার মত প্রচারকেই আধুনিক বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বলিয়া জ্ঞান করে; কত তর্ক কত দ্বন্দ্ব কত ঘাত প্রতিঘাত তাহার আর সীমা নাই।

এইরূপই হইয়া থাকে এবং এইরূপই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল সে কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা আত্মাভিমানে সর্ব্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই।

ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রথম প্রমাণ, রামমোহন রায়কে আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গদেশের নির্ম্মাণকর্ত্তা বলিয়া আমরা জানি না। কি রাজনীতি, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি সমাজ, কি ভাষা – আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই। এমন কি, আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে রামমোহন রায় তাহারও পথপ্রদর্শক। যখন নব-শিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা, তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিস্মৃতপ্রায় বেদ পুরাণ তন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ অদ্য সেই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না।

রামমোহন বঙ্গদেশকে গ্র্যানিট্‌স্তরের উপর স্থাপন করিয় নিমজ্জনদশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র অ তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলি মৃ ক্ষেপন করিয়া গিয়াছেন। আজ বাঙ্গলাদেশ কেবল দৃঢ় বাস নহে, উর্ব্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথা ভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরে ফলিয়া উঠিতেছে।

৫৪৩

মাতৃভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরব-শালিনী করিয়া তুলিয়াছেন তিনি বাঙ্গালীর যে কি মহৎ কি চির-স্থায়ী উপকার করিয়াছেন সে কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই।

তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি পণ্ডিতেরা তাহাকে বর্ব্বর জ্ঞান করিতেন। বাঙ্গলা ভাষায় যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করা যাইতে পারে সে কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এই জন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকদের জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেন। সেই সকল পুস্তকের সরলতা ও পাঠযোগ্যতা সম্বন্ধে যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা আছে তাঁহারা রেভেরণ্ড্ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পূর্ব্বতন এণ্ট্রেন্স্-পাঠ্য বাঙ্গলা গ্রন্থে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন।

অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীনমলিনভাবে কালযাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য্য কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইত না। যেখানে মাতৃভাষার এত অবহেলা সেখানে মানবজীবনের শুষ্কতা শূন্যতা দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।

এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই উপেক্ষিতা ...চিতা দীনহীনা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন। তখনকার ...ন কি যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাঁহারই প্রসাদে ...কার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।

...ন তাঁহা অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ... দুই ছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন।

ইংরাজি সমুদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালীর মত বালির বাঁধ নির্ম্মাণ করিতেছেন সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমান সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে! সম্পূর্ণ ক্ষমতাসত্বেও আপন সমযোগ্য লোকের উৎসাহ এবং তাঁহাদের নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া একটি অপরীক্ষিত অপরিচিত অনাদৃত অন্ধকার পথে আপন নবীন জীবনের সমস্ত আশা উদ্যম ক্ষমতাকে প্রেরণ করা কত বিশ্বাস এবং কত সাহসের বলে হয় তাহা পরিমাণ করা আমাদের পক্ষে সহজ নহে।

কেবল তাহাই নহে তিনি আপনার শিক্ষাগর্ব্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য্যপ্রেম মহত্বভক্তি স্বদেশানুরাগ—শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্ব্বে সেই অনাদরমলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

তখন, পূর্ব্বে যাঁহারা অবহেলা করিয়াছিলেন তাঁহারা বঙ্গভাষার যৌবনসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগি- লেন। বঙ্গসাহিত্য প্রতিদিন গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগি-

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও দুঃসাধ্য হইত। প্রথমতঃ, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল ত যে, শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত কর পারে ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য

দ্বিতীয়তঃ, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোন আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য ঔৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভাল লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্ব্বদা সম্মুখে বর্ত্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতি লাভের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, অশ্রান্তযত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম্ম। চতুর্দ্দিকব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মত এমন গুরুভার আর কিছুই নাই; তাহার নিয়ত প্রবল ভারাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম্ম তাহা এখনকার সাহিত্য ব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন— তখন যে আরও কত কঠিন ছিল তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্ব্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব।

বঙ্কিম আপনার অন্তরের সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া প্রতিভা-বলে যে কার্য্য করিলেন তাহা অত্যাশ্চর্য্য। বঙ্গদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাহার পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত। দার্জ্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়-রবিরশ্মিসমুজ্জ্বল তুষারমুকুটিত মস্তক চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ গিরি-পারিষদ্‌বর্গের কত ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে! বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী সাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে; একবার ... নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার ... সহজে অনুমান করা যাইবে।

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান করিতেন যে দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্দ্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

তখন সময় আরও কঠিন ছিল। বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আপন ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোক যে এক লম্ফে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখনও দাঁড়াইয়া যায় নাই। সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্য্যে এক হস্ত নিবারণ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সাহিত্যের পক্ষে যাহা কিছু অযোগ্য, যাহা কিছু অনাবশ্যক, যাহাতে কিছুমাত্র অবহেলা বা অক্ষমতা প্রকাশ পাইত তাহাকে তিনি কদাচ মার্জ্জনা করিতেন না। এই সমস্ত স্বল্প ক্ষুদ্র প্রাণীদের প্রতি তিনি এমন কঠোর আঘাত এমন সু বিদ্রূপ প্রয়োগ করিতেন যে, অনেক সময় তাহা অনাবশ্যক নি বলিয়া মনে হইত ;—অনেক সময় মনে হইত এই সকল ক্ষী দের প্রতি বঙ্কিমের প্রবল বাহুর আঘাত যথাযোগ্য নহে। যতঃ তখনও বাঙ্গালা লেখার শৈশব অভ্যাসগুলি দূর

লেখকেরা তখনও বঙ্কিমের নূতন রাজত্বের কঠিন নিয়ম সকল ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারে নাই, সে অবস্থায় সহজেই অনেক ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া দোষকে কম করিয়া দেখিয়া এবং গুণকে বাড়াইয়া তুলিয়া সাধারণতঃ উৎসাহ এবং প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা হয়। বঙ্কিমের রাজদণ্ড সেরূপ দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে নাই। তিনি নির্দ্দয়ভাবে ঠক বাছিতে গিয়া গাঁ উজাড় করিবার যো করিয়াছিলেন।

কিন্তু বঙ্কিমের এই নিষ্ঠুরতা উচ্চ লক্ষ্য, অটল সংকল্প এবং মহৎ পৌরুষের নিষ্ঠুরতা। বৃহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যাঁহার প্রবল অনুরাগ তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্নকে নির্ম্মমভাবে ছেদন করিয়া ফেলেন। যাঁহার আদর্শ অত্যন্ত উন্নত তাঁহার বিচার অনুরূপ কঠিন।

নিজের বাগানের প্রতি যে মালীর যথার্থ অনুরাগ আছে, ছোটখাট কাঁটা গুল্ম জঙ্গলকে সে তীক্ষ্ণ কোদালি দিয়া সবলে সমূলে উচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। যে সকল ক্ষুদ্র তৃণগুল্মজঙ্গল অনাদরে জন্মে তাহাদিগকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, তাহারা দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, গুণে না হৌক্ সংখ্যায় প্রধান হইয়া দাঁড়ায়, ভালয় মন্দয় এমন একাকার হইয়া যায় যে নির্ব্বাচন করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। তখন ভাল জিনিব আপন জন্মভূমি হইতে প্রাণধারণযোগ্য যথেষ্ট রস পায় না, ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া আসে।

এই কারণে, মন্দ রচনা সাহিত্যের বিচারালয়ে যেরূপ দণ্ড পায়, রচনা মন্দ নহে কিন্তু ভালও নহে, যাহাতে কোন ক্ষমতা প্রকাশ নাই কোন সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হয় নাই তাহাও প্রায় অনুরূপ যোগ্য বলিয়া গণ্য হয়। উভয়ের প্রতিই নির্ব্বাসনের আদেশ হইয়া থাকে।

এই কঠিন কার্য্যের ভার লইতে অনেক সুযোগ্য লেখক

কুণ্ঠিত হন। তাহার দুই প্রধান কারণ আছে, এক ত কাজটা বড়ই অপ্রিয়, দ্বিতীয়তঃ অন্যের অপ্রিয় হইতে হয়।

লেখকের পক্ষে অপ্রিয় হওয়া একটা মহৎ ক্ষতি। কারণ, লেখা বুঝিতে বুদ্ধির যেমন আবশ্যক প্রীতির আবশ্যক তদপেক্ষা অল্প নহে। প্রথম হইতে পাঠকের মনটি যদি অনুকূল থাকে অন্ততঃ প্রতিকূল না থাকে তবে ভাবের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা তাঁহার পক্ষে অনেকটা সহজ হয়। গোড়াতেই বিমুখ হইয়া বসিলে সহস্র তর্কের দ্বারা সৌন্দর্য্য প্রতিপন্ন করা যায় না। এই জন্য প্রাচীন কবিরা অপর্য্যাপ্ত নম্রতার দ্বারা পাঠকের মন আর্দ্র করিয়া রচনা আরম্ভ করিতেন—তাঁহারা শ্রোতামাত্রকেই সুধীজন এবং সুধীমাত্রকে ক্ষীরগ্রাহী হংস এবং কেবলমাত্র আপনাদিগকে অভাজন বলিয়া প্রচার করিতেন এবং বোধ করি যথোচিত ফললাভ করিয়া মনে মনে হাসিতে ছাড়িতেন না।

কিন্তু যে লেখক সমালোচনা করেন তাঁহার পক্ষে এই নম্রতা রক্ষা করা বড় কঠিন। পাঠকেরা একেবারে বদ্ধপরিকর হইয়া অস্ত্রশস্ত্র বাঁধিয়া তাঁহার লেখা পড়িতে আরম্ভ করেন, এমন কি অধিকাংশ সময়ে পাঠ না করিয়াই অস্ত্রক্ষেপন করিতে থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে অবলা সরস্বতীর হস্তে গদা নাই, কেবল একটি বীণা আছে মাত্র।

এই কারণে, যে সকল লেখক রচনার দ্বারা অনিশ্চিতমতি পা জাতির মনোরঞ্জনের উচ্চাশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন, লোচন কার্য্যে অগ্রসর হইতে তাঁহাদের অভিরুচি হয় না। রী এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে চিত্তও অনেকটা বিক্ষিপ্ত হয়। এই দেশে সাহিত্যচর্চ্চা অধিক সে দেশে প্রায়ই লেখক এবং স সম্প্রদায় স্বতন্ত্র হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে এখনও সেই কার্য্যবিভাগের সময় আসে নাই—এবং বঙ্কিম যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তখন সেই সময় আরও সুদূরবর্ত্তী ছিল। সেই জন্য রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যই তিনি বীরের ন্যায় একাকী গ্রহণ করিলেন। এই দুষ্কর ব্রতানুষ্ঠানের যে ফল তাহাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। মনে আছে, বঙ্গ-দর্শনে যখন তিনি সমালোচক পদে আসীন ছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হোক্ তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। এবং কল্পনাপ্রবল লেখকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক। ছোট ছোট দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না তাহা নহে কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্ত্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন বর্ত্তমানের কোন উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না,—সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমন করিতে পারিবেন। এই জন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন, কোন দিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব্ব করিতে হয় নাই।

বঙ্কিম যে দিন সমালোচকের আসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন সে হইতে এ পর্য্যন্ত আর সে আসন পূর্ণ হইল না। সাহিত্যের এখনকার সমালোচনার কোন প্রভাব নাই। সাধারণে এখন-মালোচনা কেবল বিজ্ঞাপনস্তম্ভ সজ্জিত করিবার আয়োজন দখে। যথার্থ রসবোধ এবং সূক্ষ্ম বিচার প্রকাশ পায় এমন া বহুকাল দেখা যায় নাই। গ্রন্থ সমালোচনার ভার

অনেক সময়ে অযোগ্য লোকের হস্তে ন্যস্ত হয় এবং অনেক কৃতবিদ্য লেখকও অত্যুক্তি, কাল্পনিকতা এবং অবান্তর প্রসঙ্গে তাঁহাদের সমালোচনা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন; গ্রন্থের অন্তর্গত প্রকৃত সাহিত্য-পদার্থকে প্রাধান্য না দিয়া তাহার আনুষঙ্গিক নীতি অথবা অন্য কোন তত্ত্বকথার অবতারণা করিয়া পাঠকের চিত্তকে যথার্থ সাহিত্য-পথ হইতে ভ্রষ্ট করেন। অন্য হিসাবে তাহার গৌরব থাকিতে পারে কিন্তু সমালোচনার হিসাবে তাহার মূল্য নাই। তাহাতে পাঠকদের মনে রসবোধ বা নির্ব্বাচনশক্তির চর্চ্চা হয় না।

সেইজন্য এখনকার সাহিত্যে বিস্তর স্বেচ্ছাচারিতা এবং ইতর ভাবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এখনকার কোন রচনা কোন যথার্থ শ্রদ্ধেয় সমালোচকের হস্তে কোনরূপ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয় না—সকলেই স্বপ্রধান হইয়া উঠিয়াছেন এবং সাহিত্যক্ষেত্র জঙ্গলে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্যের মধ্যে সংযমের, সৌন্দর্য্যের, শিষ্টতার এবং উচ্চ আদর্শের আবশ্যক কেহ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন না, স্বাভাবিক বিচার শক্তির সহিত নিরপেক্ষ ভাবে দণ্ডপুরস্কার বিধান করিবার কেহই নাই, পত্রে এবং সংবাদপত্রে উৎসাহ অত্যন্ত মুক্তহস্তে বিতরিত হইয়া থাকে এবং রাজকোষের শূন্য অবস্থায় কাগজের নোট যেরূপ অজস্র অথচ অনাদৃত হইয়া উঠে এই সকল প্রাচুর্য্যবিশিষ্ট সমালোচনাও সাধারণের নিকট সেইরূপ প্রায় বিনা মূল্যে বিক্রীত হয়।

এই বর্ত্তমান দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া কাহারও প্রতি দোষা[…] করা আমার অভিপ্রায় নহে। বিশেষতঃ এ দোষের অং[…] আমাদিগের সকলকেই বহন করিয়া লইতে হইবে তখ[…] মধ্যে নিজের সান্ত্বনা বা শ্লাঘার কারণ কিছুই দেখি ন[…] এই অরাজকতার চিত্র মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইতে[…]

বুঝিতে পারিবেন, সাহিত্য-সিংহাসনে কে আমাদের রাজা ছিলেন এবং তাঁহার অভাবে সে শাসনভার গ্রহণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি কেহই উপস্থিত নাই। ইহাও বুঝিতে পারিবেন বঙ্কিম যখন আমাদের সাহিত্যতরীর কর্ণধার হইয়াছিলেন তখন তরণী কেন এমন আশ্চর্য্য বেগে অগ্রসর হইয়াছিল, আর আজই বা "কেন সে যথেচ্ছা ভাসিয়া যাইতেছে এবং নানা বাতাসে ঘুরিয়া মরিতেছে। আমাদের কাহারও সে ক্ষমতা নাই, সে সাহস নাই, সে প্রতিভা নাই। আমরা যদি বা স্বস্ব শক্তি অনুসারে কেহ কেহ কোন কোন বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারি, কিন্তু বর্ত্তমানের গতিকে নিয়মিত করা, সমস্ত সাহিত্যকে চালনা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। বঙ্গদর্শন তখনকার সমস্ত বঙ্গসাহিত্যের মর্ম্মস্থলে শ্রীস্বরূপে বিরাজ করিতেছিল—এখন সে স্থান শূন্য। সেই জন্য এখনকার সাহিত্যের বিশেষ কোন আকার প্রকার দেখা যায় না; তাহার আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু তাহার রূপ নাই; তাহার কোন লক্ষণ নাই, আদর্শ নাই, বিবেকশক্তি নাই, তাহার পক্ষে সকল পথই সমান। সংসারযুদ্ধে বঙ্গসাহিত্যের সারথী কৃষ্ণ যেন আজ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে কৃষ্ণের সহিত আমি আজ বঙ্কিমের তুলনা করিলাম। বঙ্কিমের মহাগ্রন্থ কৃষ্ণচরিত্র পাঠ করিলে লেখকের হিত লেখকের আদর্শচরিত্রের সাদৃশ্য স্বতঃই মনে উদয় হয়।

সাহিত্যের মধ্যেও দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়, ধ্যানযোগী কর্ম্মযোগী। ধ্যানযোগী একান্তমনে বিরলে ভাবের চর্চ্চা তাঁহার নিজেরই সহিত নিজের নিবিড় সম্বন্ধ। তাঁহার ি সংসারী লোকের পক্ষে যেন উপুরি-পাওনা যেন যথা-ভ। আর সাহিত্যের কর্ম্মযোগী নিজের প্রতিভা নিজের

আনন্দ দ্বারা সংসারকে পূর্ণ করিতে চেষ্টা করেন। একজন স্থির সরোবরের মত, আর একজন চির-প্রবাহিত উৎসের ন্যায়। গভীরতা হয়ত উভয়েরই সমান এবং উভয়েরই অপরিজ্ঞেয় অন্তরতলে ভাবের অক্ষয় আধার আছে। কেবল একজনের ধ্যান এবং শান্তি, অপরের গতি এবং উৎসাহ।

বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্য্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য কি বিজ্ঞান কি ইতিহাস কি ধর্ম্মতত্ত্ব যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

কিন্তু তিনি যে কেবল অভয় দিতেন সান্ত্বনা দিতেন অভাব পূর্ণ করিতেন তাহা নহে, তিনি দর্পহারীও ছিলেন! এখন যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের সারথ্য স্বীকার করিতে চান তাঁহারা দিনে নিশীথে বঙ্গদেশকে অত্যুক্তিপূর্ণ স্তুতিবাক্যে নিয়ত প্রসন্ন রাখিতে চেষ্ট করেন কিন্তু বঙ্কিমের বাণী কেবল স্তুতিবাদিনী ছিল না, খড় ধারিণীও ছিল। বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত কৃষ্ণচরিত্রে বর্ত্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্ম্মের যে অস্ত্রাঘাত আছে সে আঘাতে বেদনাবোধ এবং কথঞ্চিৎ লাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি আর কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নি উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না।

বঙ্কিম প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ঐতিহাসিক বিচার প্রয়োগ করিয়া তাহার সার এবং অসার ভাগ পৃথক্‌করণ, তাহার প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ এমন নিঃসঙ্কোচে করিয়াছেন যে এখনকার দিনে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।

বিশেষতঃ দুই শত্রুর মাঝখান দিয়া তাঁহাকে পথ কাটিয়া চলিতে হইয়াছে। একদিকে, যাঁহারা অবতার মানেন না তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবত্বারোপে বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ান। অন্যদিকে যাঁহারা শাস্ত্রের প্রত্যেক অক্ষর এবং লোকাচারের প্রত্যেক প্রথাকে অভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহারাও, বিচারের লৌহাস্ত্র দ্বারা শাস্ত্রের মধ্য হইতে কাটিয়া কাটিয়া কুঁদিয়া কুঁদিয়া মহত্তম মনুষ্যের আদর্শ অনুসারে দেবতাগঠনকার্য্যে বড় প্রসন্ন হন নাই। এরূপ অবস্থায় অন্যকেহ হইলে কোন এক পক্ষকে সর্ব্বতোভাবে আপন দলে পাইতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু সাহিত্য-মহারথী বঙ্কিম দক্ষিণে বামে উভয় পক্ষের প্রতিই তীক্ষ্ণ শরচালন করিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহার নিজের প্রতিভা কেবল তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল। তিনি যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন—বাক্‌চাতুরী দ্বারা আপনাকে বা অন্যকে বঞ্চনা করেন নাই।

কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ ...ছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট ...রবদ্ধ—কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র কিন্তু ... অদ্ভুত আতিশয্যে অসঙ্গতরূপে স্ফীতকায়। তাহার মধ্যে ...আলোকের লেশ আছে ধূমের অংশ তাহার শতগুণ। যাহা- ...তা অল্প তাহারা সাহিত্যে প্রায় এই প্রধূমিত কাল্পনিক- ...য় লইয়া থাকে—কারণ, ইহা দেখিতে প্রকাণ্ড কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত লঘু। এক শ্রেণীর পাঠকেরা এইরূ
পরিমাণ কৃত্রিম কাল্পনিকতার নৈপুণ্যে মুগ্ধ এবং অভিভূত
পড়েন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গলায় সেই শ্রেণীর পাঠক বিরল
এই কাল্পনিকতার কল্যাণে আজকাল অনেক কৃতবিদ্য
মুখেও এমন কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের প্রতি
নুগ্রহের এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতার এক প্রমাণ এবং কার
যে, পৃথিবীর মধ্যে কেবল ভারতবর্ষেই ষড়ঋতুর প্রাদুর্ভাব
যায়।

সকল সময়ে ঠিক এতদূর পর্য্যন্ত না গেলেও আমাদের অ
লেখক এইপ্রকার অদ্ভুত আতিশয্যের কাছ ঘেঁষিয়া যান। এই
অপরিমিত অসংযত কল্পনার দেশে বঙ্কিমের ন্যায় আদর্শ আমা
পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। কৃষ্ণচরিত্রে উদ্দাম ভাবের আবেগে তাঁহ
কল্পনা কোথাও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছুটিয়া যায় নাই। প্রথম হই
শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তিনি পদে পদে আত্মসম্বরণ পূর্ব্বক যুক্তির সু
র্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন তাহাত
হার প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা লিখেন নাই তাহাতেও
াহার অল্প ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই।

বিশেষতঃ বিষয়টি এমন যে ইহা

কপ্রাচুর্য্যে এবং কল্পনাকুহকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেন,
জের বিশ্বাস ও ভাষাকে যথাসাধ্য টানিয়া বুনিয়া আশে পাশে
রিয়া অধিক পরিমাণ লোককে আপন মতের জালে আকর্ষণ
চেষ্টা করিতেন। বঙ্কিম যেখানে ইষ্টকের উপর ইষ্টক
করিয়া সমুন্নত সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এখনকার
হৃদয়াবিক্যবিশিষ্ট লেখক সে স্থলে প্রচুর বাষ্পোচ্ছ্বাসযোগে
নির্ম্মাণ করিয়া একেবারে মেঘরাজ্যে ছাড়িয়া দিতেন—কিন্তু
বলুন যতই উচ্চে উঠুক্ না কেন তাহা ভিত্তিহীন, তাহা কিছু
নর জন্য সাধারণের কৌতুহলজনক কিন্তু বাসযোগ্য নহে, এবং
ই বেলুনযোগে যিনি আপন যশকে উর্দ্ধে উড্ডীন করিয়া দিতেন
দিন আকস্মিক পতনে অপমৃত্যুর জন্য সে যশকে প্রস্তুত হইয়া
কিতে হইত।

বঙ্কিম গীতার উপদেশ অনুসারে কেবলমাত্র আপনার কর্ম্ম করিয়া
য়াছেন, ফললাভের প্রতি দৃক্‌পাত করেন নাই। তিনি নিজে
কৃষ্ণকে পরিপূর্ণ ভক্তি করিতেন অথচ আধুনিক কৃষ্ণভক্তদিগ
প্রসন্ন করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই, তিনি কৃষ্ণের দে
সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন অথচ বহুযত্নে বহুসাবধানে কৃষ্ণচরিত্র হ
দূর করিয়া দিয়াছেন; আমাদের দে

একদিকে রীতিমত পরিচয়ের অভাব, অন্যদিকে
অভ্যাস এবং সংস্কারের অন্ধতা; যথার্থ ইতিহা
সঙ্কটের মাঝখান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে
সাহায্যে শাস্ত্রের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে এ
সাহায্যে তাহার অমূলক অংশ পরিত্যাগ করি
বন্যার ইঙ্গিতে লেখনীকে বেগ দিতে হইবে, সেই
তাহাকে সর্ব্বদা সংযত করিতে হইবে। এই সকল
বঙ্কিমের ছিল।—সেই জন্য মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে তিনি
বেদ পুরাণ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন
সাহিত্যের বড় আশার কারণ ছিল, কিন্তু মৃত্যু সে আ
হইতে দিল না, এবং আমাদের ভাগ্যে যাহা অসম্পন্ন রহিয়া গেল
তাহা যে কবে সমাধা হইবে কেহই বলিতে পারে না। যুক্তিবিচারকে প্রাধান্য না দিয়া বঙ্কিম যদি নিজেই গুরু সাজিয়া দাঁড়াইতেন, অনুসন্ধান দ্বারা সত্যের দিকে পথ নির্দ্দেশ না করিয়া তিনি যদি নিজেকেই ধ্রুবতারা বলিয়া প্রচার করিতেন দেশের লোকের মনের গতি বুঝিয়া তিনি যদি অন্ধবিশ্বাস এবং অলৌকিকবাদকে আপন পক্ষভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেন তবে এই দেবানুগৃহীত বঙ্গদেশে অনায়াসেই তিনি একজন নূতন অবতার হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন। তবে তাঁহার অসংখ্য উন্মত্ত শিষ্যগণ এমন নিবিড় ব্যূহরচনা করিয়া আজ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত যে, আমরা সাহিত্যভক্তগণ আর সহজে আমাদের গুরুর সমীপবর্ত্তী হইতে পারিতাম না।

বঙ্কিম এই যে সর্ব্বপ্রকার আতিশয্য এবং অসঙ্গতি হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন ইহা তাঁহার প্রতিভার প্রকৃতিগত। যে কেহ তাঁহার রচনা পড়িয়াছেন সকলেই জানেন বঙ্কিম হাস্যরসে সুরসিক ছিলেন। যে পরিষ্কার যুক্তির আলোকের দ্বারা সমস্ত আতি-

৩২৮

াশ হইয়া পড়ে হাস্যরস সেই কিরণেরই একটি
্যস্ত গেলে একটি ব্যাপার হাস্যজনক হইয়া উঠে
ব করিতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা হাস্যরসরসিক
রণে একটি বোধশক্তি আছে যদ্দ্বারা তাঁহারা সকল
হইলেও অপরের কথাবার্ত্তা আচার ব্যবহার এবং
সুসঙ্গতির সূক্ষ্ম সীমাটুকু সহজে নির্ণয় করিতে

সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন
তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্যরসের সহিত এক
বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। আদিরসেরই সহিত যেন তাহার কোন একটি সর্ব্বউপদ্রবসহ বিশেষ কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিল এবং ঐ রসটাকেই সর্ব্বপ্রকারে পীড়ন ও আন্দোলন করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিহাস বিদ্রূপ প্রকাশ পাইত। এই প্রগল্‌ভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র থাক্ কখনও সম্মানের অধিকারী ছিল না। যেখানে গম্ভীর ভাবে কোন বিষয়ের আলোচনা হইত সেখানে হাস্যের চপলতা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত।

বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্ব্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর

উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যালোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

কেবল সুসঙ্গতি নহে, সুরুচি এবং ... সীমা নির্ণয় করিতেও একটি স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তির আবশ্যক। মাঝে মাঝে অনেক বলিষ্ঠ প্রতিভার মধ্যে সেই বোধশক্তির অভাব দেখা যায়। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভায় বল এবং সৌকুমার্য্যের একটি সুন্দর সম্মিশ্রণ ছিল। নারীজাতির প্রতি যথার্থ বীরপুরুষের মনে যেরূপ একটি সসম্ভ্রম সম্মানের ভাব থাকে তেমনই সুরুচি এবং শীলতার প্রতি বঙ্কিমের বলিষ্ঠ বুদ্ধির একটি ভদ্রোচিত বীরোচিত প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্কিমের রচনা তাহার সাক্ষ্য। বর্ত্তমান লেখক যে দিন প্রথম বঙ্কিমকে দেখিয়াছিল, সে দিন একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে বঙ্কিমের এই স্বাভাবিক সুরুচিপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সে দিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ-রিয়্যুনিয়ন্ নামক মিলন সভা বসিয়াছিল। ঠিক কত দিনের কথা ভাল স্মরণ নাই কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সে দিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বলকৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকানপরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহারো পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী

একসঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের [illegible]ক্ষিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিম বাবু। মনে আছে প্রথম দর্শনে [illegible]ার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্ব্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেক বার তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, তাঁহার নিকট অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার মুখশ্রী স্নেহের কোমল-হাস্যে অত্যন্ত কমনীয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রথম দর্শনে সেই যে তাঁহার মুখে উদ্যত খড়্গের ন্যায় একটি উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ প্রবলতা দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা আজ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।

সেই উৎসব উপলক্ষ্যে একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশানুরাগমূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সহসা একটি শ্লোকে পতিত ভারতসন্তানকে লক্ষ্য করিয়া একটা অত্যন্ত সেকেলে পণ্ডিতী রসিকতা প্রয়োগ করিলেন, সে রস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া উঠিল। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া দক্ষিণ করতলে মুখের নিম্নার্দ্ধ ঢাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে অন্য ঘরে পলায়ন করিলেন।

বঙ্কিমের সেই সসঙ্কোচ পলায়ন দৃশ্যটি অদ্যাবধি আমার মনে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে সময়কার সাহিত্য অন্য যে কোন প্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক্ ঠিক সুরুচি শিক্ষার উপযোগী ছিল না। সে সময়কার অসংযত বাক্‌যুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে দীক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া ইতরতার

প্রতি বিদ্বেষ, সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা এবং শ্লীলতা সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ বেদনা-বোধ রক্ষা করা যে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতা প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা দেখা যায় না। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইয়া যায় নাই।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কি চিরঋণে আবদ্ধ তাহা যেন কোন কালে বিস্মৃত না হন। বঙ্কিমের প্রতিভা যদি আমাদের পথ খনন করিয়া না দিত তবে আমরা এত দিনে শিশুপাঠ গ্রন্থের প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ তৃতীয় ভাগ শেষ করিয়া বড় জোর চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ ভাগে গিয়া উপনীত হইতাম। কিন্তু বঙ্গসাহিত্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইত না। আজ আমাদের কোন লেখা যদি বয়স্কলোকের পাঠযোগ্য, শিক্ষিত লোকের সমাদরযোগ্য বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদযোগ্য হইয়া থাকে, কোন রচনার একটি অংশও যদি সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে স্থায়ী হইবার উপযোগী সুসম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া থাকে, তাহা অনেকটা পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসাদে। একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মত এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহাতে কেবল স্থানী গ্রাম্যসুর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে সেই তাঁহার স্বহস্তসম্পূর্ণ স্নেহপালিত ক্রোড়সঙ্গিনী বঙ্গভাষা আ

বঙ্কিমের জন্য অন্তরের সহিত রোদন করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি এই শোকোচ্ছ্বাসের অতীত শান্তিধামে দুষ্কর জীবনযজ্ঞের অবসানে নির্ব্বিকার নিরাময় বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার মুখে একটি কোমল প্রসন্নতা, একটি সর্ব্বদুঃখতাপ-হীন গভীর প্রশান্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল—যেন জীবনের মধ্যাহ্নরৌদ্রদগ্ধ কঠিন সংসারতল হইতে মৃত্যু তাঁহাকে স্নেহ-সুশীতল জননীক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছে। আজ আমাদের বিলাপ পরিতাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না, আমাদের ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিবার জন্য সেই প্রতিভাজ্যোতির্ম্ময় সৌম্য প্রসন্নমূর্ত্তি এখানে উপস্থিত নাই। আমাদের এই শোক এই ভক্তি কেবল আমাদেরই কল্যাণের জন্য। বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এই শোকে এই ভক্তিতে সেই আদর্শপ্রতিমা আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল এবং স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হউক্। প্রস্তরের মূর্ত্তি স্থাপনের অর্থ এবং সামর্থ্য আমাদের যদি না থাকে, তবে একবার তাঁহার মহত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে আমাদের বঙ্গহৃদয়ের স্মরণস্তম্ভে স্থায়ী করিয়া রাখি। ইংরাজ এবং ইংরাজের আইন চিরস্থায়ী নহে; রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক, সমাজনৈতিক মতামত সহস্রবার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; যে সকল ঘটনা যে সকল অনুষ্ঠান আজ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যাহার উন্মাদনার কোলাহলে সমাজের খ্যাতিহীন শব্দহীন কর্ত্তব্যগুলিকে নগণ্য বলিয়া ধারণা হইতেছে কাল তাহার স্মৃতিমাত্র চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে না পারে; কিন্তু যিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্ব্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায়

স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই আমাদিগের নিকট যথার্থ শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের শূন্যতার মধ্যে চির-সৌন্দর্য্যের অক্ষয় আকর উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে যাহা কিছু অমর এবং আমাদিগকে যাহা কিছু অমর করিবে সেই সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার পোষণ করিবার প্রকাশ করিবার এবং সর্ব্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা তাহাকেই তিনি বলীয়ান্ এবং মহীয়ান্ করিয়াছেন। আমাদের যে অন্তঃপুরে সূর্য্যকিরণ এবং বায়ু প্রবেশ নিষেধ সেখানে তিনি নিখিল বিশ্বের আনন্দপ্রবাহ সমীরিত করিবার পথ করিয়া দিয়াছেন, এবং যে বাঙ্গালী হৃদয় অনেক বয়স পর্য্যন্ত অন্তরের মধ্যে অপরিচিত দুর্ব্বোধ বিদেশীয় সাহিত্য সম্পূর্ণ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া চিরজন্মের মত অপরিপুষ্ট উপবাসকৃশ এবং হীনবল হইয়া থাকে তাহার দ্বারদেশে তিনি খাদ্য উপনীত করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আমরা অপরাপর জাতির নিকট চিরদিন ঋণ গ্রহণ করিয়া অবশেষে কথঞ্চিৎ সুদসমেত তাহা পরিশোধপূর্ব্বক যাহাতে নিজের নিকট আত্ম-সম্মান এবং পরের নিকট শ্রদ্ধার অধিকারী হইতে পারি এমন [illegible]বিধা তিনি করিয়া দিয়াছেন।

[illegible]চনাবিশেষের সমালোচনা ভ্রান্ত হইতে পারে—আমাদিগে[illegible]
[illegible]ংস্তি কালক্রমে শিক্ষা রুচি এবং অ[illegible] পরি-
[illegible]র পুরুষের নিকট তাহা নিন্দিত এ[illegible] [illegible]ন্দিত
[illegible]ন্ত বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং [illegible] [illegible]ের
[illegible]রিয়া দিয়াছেন; তিনি ভগীরথের ন্যা[illegible] [illegible]য়া
[illegible]াবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এ[illegible] সেই
[illegible]ড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রা[illegible]

রাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ কথা কোন বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।

এই কথা স্মরণে মুদ্রিত করিয়া সেই বাঙ্গলা লেখকদিগের গুরু, বাঙ্গলা পাঠকদিগের সুহৃদ, এবং সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি, যিনি জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্ব্বেই, নূতন অবকাশে নূতন উদ্যমে নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলার হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক গত শতাব্দীর বর্ষশেষের পশ্চিম দিগন্তসীমায় অকালে অস্তমিত হইলেন।

অধিক দিনের কথা নহে; ইতিপূর্ব্বেই যে সভায় আমি সাধারণের সমক্ষে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সভাপতি থাকিয়া আমাকে পরম সম্মানিত এবং উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তখন কে কল্পনা করিয়াছিল তাহার অনতিকাল পরে পুনশ্চ এই সাধারণ সভায় দাঁড়াইয়া তাঁহার বিয়োগে বঙ্গসাহিত্য এবং বঙ্গদেশের হইয়া আমাকে শোক প্রকাশ করিতে হইবে! কে জানিত আমার সহিত তাঁহার সেই শেষ ঐহিক সম্বন্ধ! একদিন আমার প্রথম বয়সে কোন নিমন্ত্রণসভায় তিনি নিজ কণ্ঠ হইতে আমাকে পুষ্পমাল্য পরাইয়াছিলেন, সেই আমার জীবনের সাহিত্যচর্চ্চার প্রথম গৌরবের দিন। তাহার পরে সেদিন তিনি আমার প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সমাদর সহকারে আমার বক্তৃতার স্থলে সভাপতি হইতে স্বীকা[illegible] করিলেন; সে সৌভাগ্য অল্প লোকের পক্ষে এমন বিরল ছিল [illegible] সেই সমাদরবাক্য এমন অন্তরের সহিত উচ্চারিত হইয়া[illegible] আজ [illegible]হা লইয়া সর্ব্বসমক্ষে গর্ব্ব করিলে ভরসা [illegible] আমা[illegible] মার্জ্জনা করিবেন। কিন্তু সেই পুরস্কার [illegible] হইতে [illegible]মার শেষ পুরস্কার হইবে তাহা আমি স্ব[illegible] না। সেই সকল উৎসাহবাক্য সাহিত্যপথযাত্রার [illegible] স্বরূপে আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে সাদরে রক্ষিত [illegible] উচ্চ[illegible]ব পুরস্কার আর এ জীবনে প্রত্যাশা করিতে[illegible]

[illegible] অধিবেশনে পঠিত।